মায়াদিগন্ত

শক্তিপদ রাজগুরু

পূর্ণ প্রকাশন
৮এ, টেমার লেন, কলিকাতা—৯

প্রথম প্রকাশ : কার্তিক, ১৩৬৩

প্রকাশক :

শ্রীরথীন্দ্রনাথ বিশ্বাস

৮এ, টেমার লেন

কলিকাতা—৯

মুদ্রাক

রবীন্দ্র

নিউ মানস প্রিন্টিং

১/বি গোয়াবাগান স্ট্রীট

কলিকাতা—৬

উৎসর্গ

কোন বাদলদিনে পলাশপুরের বন নির্জনের সঙ্গী

শ্রীমান পার্থ বন্দ্যোপাধ্যায়

সুপ্রীতিভাজনেষু

লোহার পাতে ঘা মেরে ষ্টেশনের চত্বরে সাড়া তোলে সিট্‌কে ছেলেটা। লোকজন বিশেষ তেমন নেই, লাইনের ওদিকে খাড়া চড়াই-এর মাথার উপর আম বট অশত্থ গাছের ছায়াঘন জটলা, ওদিকে একটা দীঘিতে জল চক চক করে। দু'চারটে গরু জল খেতে নেমেছিল। ওই ঘণ্টার শব্দে সচকিত হয়ে মুখ তুলে চাইল। এই শান্ত পরিবেশে ওই শব্দটা কেমন বেমানান, বিজাতীয় বোধ হয়।

নন্টু পোর্টার ছেলেটাকে ধমক দেয়।

—এ্যাই থাম কটাই, যে আমার ধাপধাড়া গোবিন্দপুরের ইষ্টিশান, তাতে কোন মামু টিকিট কেটে যাবেক যে তার জন্য আবার ঘণ্টা! ওইতো ক'জন প্যাসেনজার!

নন্টু গজগজ করে। অবশ্য লোকজন কিছু যাতায়াত করে, আর তাই মাঠের মাঝেও ষ্টেশনটা গড়ে উঠেছে। এদিকে চলে গেছে একটা সাইডিং লাইন, দূরের টিলা শালবনের ওদিকে কোথায় একটা কয়লা আর চিনা মাটির খাদান আছে, মাল গাড়িগুলো সেখান থেকে সাদামাটি বয়ে আনে, আর তা চালান যায় রাণীগঞ্জ-দুর্গাপুরের কারখানায়। তাই দু'একটা কয়লার লক্কড়মার্কা ইঞ্জিনও মাঝে মাঝে সাইডিং লাইনে দাঁড়িয়ে থাকে আর কালো ধোঁয়া ছাড়ে।

প্লাটফর্মে দুচারজন দেহাতী লোক মেয়েছেলে ক্ষারে কাচা কাপড় পরে মাটির চিত্র-বিচিত্র হাঁড়িতে দিশী মিঠাই লাড্ডু নিয়ে কাঁচা শাল না হয় পলাশ পাতা দিয়ে হাঁড়ির মুখ বন্ধ করে কুটমবাড়ি চলেছে দল বেঁধে। ওদিকে প্লাটফর্মের আম দেওদার দু একটা কৃষ্ণচূড়া গাছের নীচে এসে জমা হয়েছে আশপাশের গ্রামের দুধের কারবারী মানুষগুলো। ঝকঝকে টিন নাহয় বড় হাঁড়ি কাঁধে ঝুলিয়ে ওরা চলেছে কয়েকটা ইষ্টিশান পর

বড় গঞ্জ-সহরে দুধের যোগান দিতে, কেউ বা কিছু মাছ-এর পশরা, তরি-তরকারী নিয়ে চলেছে সেখানে বেচা-কেনার জন্য।

নন্দুরাম-এর সকলেই চেনা জানা। তাই ওরাও জানে নন্দুরামকে। নন্দুরাম শুধোয়।

—টিকিট কেটেছো ভজন? একখানা ওই ভেণ্ডারের টিকিট কেটে দু' মণ মাল বইছো নাকি? ধরা পড়লে দেখবে মজাখান্!

বলিষ্ঠ তাজা জোয়ান ছেলেটা হাসে। ওদিকে বুড়ো ক্ষুদিরাম ফুঁসিয়ে ওঠে—টেরেণ লেট হলে যে মণ মণ দুধ কেটে যাবেক গো, টিকিটের কথাতো কইলে শোনলাম।

নন্দু বেশ ভরাটি স্বরে বলে—আজকাল কানে কম শুনছো নাকি গ গদাই খুড়ো? ঘণ্টা হই গেছে শোননি? গাড়ি এল বলে।

দূর দিগন্তে টিলা বন আর পলাশেব সবুজ ছোঁয়াটা গিয়ে যেন আকাশে ঠেকেছে, চারিদিকেই এমনি টিলার সীমারেখা, ওর পিছনে দেখা যায় উঁচু বনঢাকা পাহাড়সীমা জায়গাটাকে ঘিরে রেখেছে। মাঝে মাঝে দু'একটা গ্রামবসতের ইশারা। কোথায় একসারি তালগাছ দৈত্যের পালের মত হুট করে মাথা তুলেছে।

দূরের নীল আকাশে দেখা যায় কালো ধোঁয়ার চাপ, সেই জমাট ধোঁয়ার কুণ্ডলীটা ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আকাশময়, আর বাতাসে ওঠে গুরু গুরু শব্দ।

পলাশ বনের ফাঁকে দেখা যায় ট্রেণখানা উৎরাই-এর মুখে বেশ জোরে নামছে। ওর তীক্ষ্ণ সিটির শব্দ ওঠে। এরপর ট্রেণখানা বিষণপুরের মাঠ পার হয়ে আউটার সিগন্যালের ওদিকে কদমদহ নদীর পুলে উঠেছে। গম্ গম্ শব্দ করে বেশ মেজাজী চালে ট্রেণখানা এগিয়ে আসে পলাশপুর ইষ্টিশানের দিকে।

যাত্রীদের মাঝে সাড়া পড়ে যায়। ওরা দুধের বাঁক, সব্জীর ঝুড়ি মালপত্র কাঁধে নিয়ে তৈরী হয়েছে। প্লাটফর্ম এখানে নীচু। রেলকর্তৃপক্ষ

একে উঁচু করার কথা এখনও ভাবেনি, অবশ্য তাতে এখানের যাত্রীদের কোন অসুবিধা নেই, ওরা এসবে অভ্যস্ত।

ট্রেণখানা প্লাটফর্ম কাঁপিয়ে ঢুকছে, হঠাৎ একটা বাচ্চা মেয়ের আর্তনাদ শোনা যায়, মেয়েটা সেজেগুজে নোতুন ফ্রক পরে মাথায় কড়ুয়া তেল মেখে কুটুম বাড়ি যাচ্ছিল মা-বাবার সঙ্গে। সগর্জনে দৈত্যের মত ইঞ্জিনটাকে ঢুকতে দেখে ভয়ে মেয়েটা দৌড় মারে ইষ্টিশানের দিকে, ট্রেণখানা যেন ওকেই চাপা দেবার জন্য আসছে।

চোঁচা দৌড় মেরেছে মেয়েটা, সঙ্গের একজন ওর পিছু নেবার আগেই নসু মেয়েটাকে ধরে ফেলেছে, সে জানে এখানের যাত্রীদের মাঝে এসব ঘটনা ঘটে। মেয়েটি ওই যাত্রীদলের কেউ হবে—ততক্ষণে এসে পড়ে মেয়েটাকে টেনে নিয়ে গিয়ে গাড়িতে তুলেছে। মেয়েটা তখনও ভয়ে চীৎকার করছে ট্রেণের মধ্যে। ট্রেণটা চলতে শুরু করেছে।

বেলা হয়ে আসে। এতক্ষণ লোকজন তবু কিছু ছিল। ট্রেণখানা চলে যেতেই দু-চারজন যাত্রী যারা নেমেছিল তারাও নীচু ষ্টেশনের এ-পাশ থেকে ওপাশের চড়াই-এর উপর উঠে যে যার গ্রাম বসতের দিকে চলেছে। দূরের আলপথ দিয়ে তাদের সারবন্দী হয়ে যেতে দেখা যায়। ষ্টেশনে নেমেছে স্তব্ধতা।

এখন আর গাড়ির ঝামেলা নেই, আবার বৈকালের দিকে একখানা গাড়ি ফিরবে, তার পরের ট্রেন সেই সন্ধ্যা বেলা, রাতে মালগাড়ি কিছু যাতায়াত করে, যাত্রীগাড়ি আর নেই।

ষ্টেশন মাষ্টার প্রমথ সকালের কাজ-কর্ম চুকিয়ে এবার একটু বসেছে ষ্টেশনের ঘরে। তরুণ ছোটবাবু নিখিলের চাকরী কয়েক বৎসর মাত্র, তার রাতের ডিউটি। তবু বেলা অবধি থাকে এখানে, বড়বাবুকে খুশী করার চেয়েও তার কাজগুলো শেখার দরকার। ষ্টেটমেন্ট, গুড্‌স্ বুকিং-এর হিসাব পত্র, চিনা মাটির ওয়াগন-এর ষ্টেটমেন্ট এগুলোর কাজও দেখে। তাতে অবশ্য প্রমথ বাবুরই সুবিধে হয়। প্রমথ বলে নিখিলকে।

—কাজ শেখার এই তো বয়েস হে। এখনই ওয়েসাইড ইষ্টিশানে সব কাজ জানতে পারবে। না হলে বড় ইষ্টিশানে যাবে—ব্যস, কর বুকিং-এর কাজ। স্রেফ টিকিট ঠোকো। না হয় লাইন ক্লিয়ার দাও। ট্রাফিকের কাজই করো। এক চোখো হরিণের হাল। রেলের রকমারী কাজ শিখতে হয়, ছোট ইষ্টিশানে থাকো। সব কাজ শিখে নিয়ে তারপর মেজাজে চলবে, কোন সমুন্ধীর কাছে মাথা নুইতে হবে না কাজের জন্য।

নিখিল মাথা নাড়ে—তা সত্যি।

প্রমথবাবুর বয়স এখন চল্লিশ পার হয়ে গেছে। এর আগে রেলের চাকরীটা নিয়েছিল বটে কিন্তু তখন চাকরীতে মন বসাতে পারে নি।

বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে অনেকেই অন্য পথে রুজিরোজগার শুরু করেছে। প্রমথও ভেবেছিল জীবনটাকে সেও অন্য কোন খাতে বইয়ে দেবে।

আশাও করেছিল ব্যবসাপত্রই করবে। তার সহপাঠী পরেশও বেপরোয়া। পয়সাওয়ালা ঘরের ছেলে, প্রমথকে সেইই বলতো।

—ওসব পুতু পুতু করিস কি রে? নে গেল—আরে এক আধটু মদ খেলে জাত যায় না।

পরেশই ওকে সেই জীবনের খবর দিয়েছিল। প্রমথকে যেন আশ্বাসের সুরে বলতো পরেশ।

—ব্যবসাপত্র শুরু করছি। বাবা বলে জঙ্গলমহালে গিয়ে কাজকর্ম ছাখ। লগ্‌-ফায়ার উডের চালানী কাজ শুরু কর।

পরেশদের কোথায় কোন বন পাহাড়ের ওদিকে বন ইজার'র ব্যবসা, চিনামাটির খাদান আছে।

প্রমথকে সেই আশ্বাস দিতো।

—চল, ব্যবসাতেই নামবি। চাকরীতে কি হবে?

প্রমথ মনে মনে তেমনি অনেক পাবার স্বপ্নই দেখেছিল। ওর লোভী ভীরু মন চেয়েছিল অনেক কিছু। কিন্তু তা হয়ে উঠেনি। জীবনের সেই ক্ষোভটাই রয়ে গেছে, কোন পাবার সার্থকতা আসেনি। দাদা'

তাই চাকরীকেই মেনে নিতে হয়েছে এখন সবচেয়ে বড় বলে। আর অনেকগুলো বছরও কেটে গেছে। পরেশের সঙ্গেও দেখা হয়নি। এখানে-ওখানে বদলি হয়ে এই বনপাহাড়ের নির্জন পরিবেশের এই ইষ্টিশানে এসে হঠাৎ সেদিন পরেশকে দেখতে পায়। এখানের থেকে একটু দূরের বনে তার কাঠের কারবার, এই ষ্টেশন দিয়েই তার মালপত্র চালান যায় ট্রেণে।

পরেশও প্রমথকে দেখে চিনতে পারে। জিপ থেকে নেমে এগিয়ে আসে পরেশ—প্রমথ না? এখনও চাকরী করছিস তাহলে?

প্রমথও অবাক হয়—তুমি এখানে?

পরেশের চেহারার কমনীয়তা মুছে গিয়ে একটা বন্য কাঠিন্য ফুটে উঠেছে। পরণে খাঁকি প্যান্ট সার্ট, ধুলোয় ঘামে বিবর্ণ।

পরেশ বলে—বনে পাহাড়ে পড়ে আছি ওই কাঠের কারবার নিয়ে। …যাক্, এখানে রয়েছিস ভালই হল। জমবে মাঝে মাঝে।

পরেশ আর সে দুজনেই অতীতের সেই সহর জীবনের বৃত্ত থেকে সরে এসেছে, নির্বাসিত হয়েছে নির্জন পরিবেশে। পরেশ ব্যাগ থেকে বোতলটা বের করে বলে।

—পূজো আহ্নিক এখনও করিস তো?

প্রমথ কিছু দিন থেকে গুরুমন্ত্র নিয়েছে। তাই পরেশের কথায় বলে।

—ইষ্টমন্ত্র নিইছি। গোবিন্দপুরের হরিনাম ব্রহ্মচারীর কাছে।

হাসছে পরেশ।

—ধ্যাৎ! ওই সব ছেঁদো গুরু নয় রে। আর আহ্নিক—মানে এ্যাই!

বোতলটা তুলে ধরে।

প্রমথ অতীতের সেই স্বপ্ন জড়ানো জীবন কামনা-বাসনার জগৎ থেকে নির্বাসিত। বলে প্রমথ।

—বিয়েথাও করলাম না।

—তাই শুরু করেছিস? চিরকালই ঢ্যামনা রয়ে গেলি। গোখরো সাপ দেখেছিস তো? পুরুষ হবে তাই। নে গেলাস আনতে বল তোর বাহনটিকে। আর বিয়ে থা কর না কর মেয়েছেলেতে অরুচি কেন বাবা? ওসব অপবাদ আমার নেই। চল একদিন জঙ্গলে দেখা যাবে তখন কেমন সাধু রে!

পরেশ হঠাৎ যেন প্রমথের জীবনের সেই চাপাপড়া জ্বালাটাকে খুঁচিয়ে জাগিয়ে দিয়ে গেছে, পরেশ ফিরে গেছে তার জঙ্গলমহালে।

প্রমথের কাছে হঠাৎ এই পলাশপুরের নির্জনতাটা কেমন অসহ্য বোধ হয়। নিজেকে ভুলে গেছল সে, কিন্তু তার হারানো মনের সব জ্বালা আবার জেগে উঠেছে।

প্রমথ এর মধ্যে দু এক দিনের জন্য বহরমপুরে তার দূর সম্পর্কের এক দিদির ওখানে গিয়েছিল, সেখানেই দেখেছে একটি মেয়েকে।

প্রমথর চোখের চাহনিতে হয়তো তার অজানতেই কি একটু ব্যাকুলতা ফুটে ওঠে। মেয়েটিকে দেখেছে তার দিদির ওখানে আসতে।

আর দিদিই বোধ হয় তেমন কিছুর টের পেয়ে বলেছিল প্রমথকে।

—বকুলকে কেমন লাগলো প্রমথ?

প্রমথের হঠাৎ খেয়াল হয় অনেকগুলো বছর তার কোন শূন্যতার মাঝে কেটে গেছে। কোথায় ঊষর মরুভূমিতে যে জলধারার স্বপ্ন দেখেছে তা মরিচীকাই। প্রমথ হাসবার চেষ্টা করে—কেন বলো তো?

দিদি জানায়—তাহলে কথাবার্তা কই ওর বাবার সঙ্গে।

প্রমথ পরদিনই ফিরে এসেছিল পলাশপুরে। তবু বারবার সেই স্নিগ্ধ শান্ত মুখখানা মনে পড়ে। নামটাও মিষ্টি, সব মিশিয়ে যেন বকুলের সৌরভ ওঠে।

হঠাৎ খেয়াল হয় বেলা হয়ে গেছে। ফার্ষ্ট ট্রেন চলে যাবার পর একটু সময় পেল।

প্রমথবাবুর হাই ওঠে। এই সময় একটু জিরিয়ে চা খেয়ে নেয়। অবশ্যি সকালেই বাসা থেকে চা আর রুটি খেয়ে বের হতো আগে।

এখন আর রুটিটা খায় না—সম্প্রতি গুরুমন্ত্র নিয়েছে, তাই স্নান গুরুপূজা না করে ইষ্ট মন্ত্র না জপে জলগ্রহণ করে না। তবে গুরুদেবই অনুমতি দিয়েছেন—চা টা খেতে পারো বাবা, ওটা খাদ্য নয়।

লোকটাকে চা নিয়ে আসতে দেখে বলে প্রমথবাবু।

—এ্যাই যে। এত দেরী কেন হে?

প্রমথবাবু গজাননের দিকে চাইল। গজাননের লম্বা চেহারায় পাক ধরেছে, তবু এখনও শক্ত সমর্থ। আর গোঁফগুলো ঝুলে পড়েছে ঠোঁটের উপর। খালি গা, পৈতেটায় চাবি বাঁধা।

গজানন চায়ের গেলাস দুটো টেবিলে নামিয়ে দিয়ে বলে—আর বলেন কেন বড়বাবু, কোন এক বরযাত্রীর দল নেমেছে। এখনও তাদের গাড়ি আসে নি পাত্রীর বাড়ি থেকে। ত্যানাদের চা চপ যোগালাম। নেন, চা জুড়িয়ে জল হয়ে যাবেক।

গজাননের চায়ের দোকান ইষ্টিশানের সীমানার বাইরে ওই চড়াই-এর উপর। আম বটগাছের ছায়ায় মাটির টানা ঘরখানার একদিকে কয়েকটা বাঁশ কাঠের মাচা মত করা। ওই তার চায়ের দোকান, মাঠের মধ্যে দোকান, তবু এটা-সেটাও মেলে সেখানে, মায় ভাতের ব্যবস্থাও করে দিতে পারে গজানন আগে বল্লে। তবে খদ্দের পত্র সীমিতই।

প্রথমবাবু বলে—গজাননের তাহলে বাজার আজ চলতি?

গজানন হাসলো—তা আজ্ঞা বিক্রী-বাটা হয়েছে কিছু।

লোকটার তিন কুলে কেউ নেই বোধহয়। কয়েক বছর আগে যাযাবরের মত ঘুরতে ঘুরতে গজানন পলাশপুরের ইষ্টিশানে এসে নেমেছিল। তখন প্রমথবাবু সবে এসেছে এখানে। তার সঙ্গী বলতে ওই নন্দু পোর্টার। আর জায়গাটা একদম ফাঁকা, কোথাও কোন আশ্রয় নেই। সিঙ্গল হ্যানডেড ষ্টেশন ডাঙ্গার ধারে গজিয়ে উঠেছে সবে।

ওই নন্দুর কোয়ার্টার ওদিকেই, বকুল গাছের ওদিকের কোয়ার্টারে উঠেছিল প্রমথবাবু, নিজের হাতে সেদ্ধ ভাত করতো। আর নন্দুর

বৌটা অবসর সময়ে এটা সেটা করে দিতো, সন্ধ্যার রুটি ডাল-এর ব্যবস্থা করেছিল প্রমথ ওর ওখানেই। তাও ওদের জুতোর শুকতলার মত রুটি খেতে কষ্ট হোত, খাবার অসুবিধাই বড় হয়ে ওঠে, কিছু মিলতো না। নস্যু ক'দিন অন্তর কোন গ্রামের হাট থেকে আলু-কুমড়ো-পিঁয়াজ-নুন-তেল কিনে আনতো। কখনও সখনও ডিম মিলতো দেহাতী গাঁয়ে। মাছের মুখও দেখা যেতো না।

নস্যুর বৌটা বলতো—হাত পুড়িয়ে রাঁনবেন কেনে বাবুজী, সাদি করেন।

প্রমথের মনে হয়েছিল কথাটা, এই নির্জন বনবাসে এসে একা একা থাকার যে একটা যন্ত্রণা আছে, এটা ক্রমশঃ বুঝেছিল। কিন্তু বিয়ে বল্লেই বিয়ে হয় না। আর মনে হয় প্রমথের—তার মত চালচুলোহীন একটা মানুষের বিয়ে হওয়াও কঠিন। আরও খেয়াল হয়—দুঃখ অভাবের মধ্যে জীবনের অনেকগুলো দিন কেটেছে, বিয়ে করার বয়সটাও পার হয়ে গেছে আগেই। এখন মাথায় টাক পড়তে শুরু হয়েছে। দেহের যৌবনের সতেজ ঋজুতা হারিয়ে গিয়ে ঈষৎ মাংসল ভাব ফুটে উঠেছে।

তাই নস্যুর বৌ রূপসীর কথায় বলে—ধ্যাৎ। আর কি বিয়ে করা সাজে রে? রান্না-বান্না হয়ে যাচ্ছে কোন রকমে। রাতের রুটি ক'খানা তোরাই তো করছিস।

রূপসী বলে—সে তো কথা লয় গো বাবু, বিহা করতে হয় মানুষকে। ঘর বসত করতে হয়।

প্রমথ এমনি দিনে দেখেছিল গজাননকে। ষ্টেশনে লোকজন বিশেষ থাকে না। ক্রমশঃ ষ্টেশন একটু চালু হচ্ছে। আশেপাশের গ্রামগুলোর মানুষ এবার বুঝেছে ট্রেণে করে তারা দূরের গঞ্জ সহরে—রেল জংশনে পুকুরের মাছ, ক্ষেতের আনাজপত্র নিয়ে গিয়ে বিক্রী করে দু' পয়সা আনতে পারবে। এতকাল এসব করেনি তারা, বিক্রীর বাজার ছিল না। আর ট্রেণও থামতো না এখানে। ইষ্টিশান রূপগাঁ ছিল কয়েক মাইল দূরে।

এবার তাঁদের গ্রামগুলোর কাছাকাছি ইষ্টিশান হয়েছে, শহরে যাবার গাড়ি দাঁড়াচ্ছে, যাতায়াতের ব্যবস্থা হয়ে যেতে তারাও এবার ওই আনাজপত্র তৈরী করছে। ছোটখাটো ব্যবসার কথা ভাবছে।

এখানের চাষীরা ক্ষেতে এখন রকমারি তরি-তরকারী করছে, পুকুরের মাছও নিয়ে যায় গঞ্জে। আর দুধের ব্যবসা শুরু হয়েছে, গাই-গরু পুষে বেশ প্রচুর দুধই চালান দেয় তারা শহরে।

ষ্টেশনের কাজ বাড়ছে, প্রথমবাবুর রান্নারও সময় হয়না। আর একজন সহকারী ষ্টেশন মাষ্টারের জন্যও লেখাপড়া চলছে। প্রমথ একা হিমসিম খেয়ে যায় কাজ সামলাতে। রান্নারও সময় পায় না।

সেদিন দেখে লোকটা ষ্টেশনের গাছতলায় বসে আছে। হয়তো কোথাও যাবে। কিন্তু বৈকালের ট্রেণ পার হয়ে যাবার পরও দেখেছে প্রমথ লোকটাকে বসে থাকতে। ওদিকের কুয়ো থেকে জল তুলে তাই গিলছে, হয়তো খেতেও পায়নি সে। জল খেয়ে লোকটা প্লাটফর্মের বেঞ্চে ময়লা একটা চাদর পেতে শুয়ে পড়ল। মনে হয় এখানেই যেন পাকাপাকিভাবে আস্তানা গাড়তে চায় সে। যাবার ঠাঁইও আর কোথাও ওর নেই।

প্রমথের ডাকে লোকটা চাইল মুখ তুলে, প্রমথ শুধায় ওকে।

—কোথায় যাবে হে?

গজানন মাষ্টারবাবুকে চিনেছে। তাই ওকে দেখে বেঞ্চে উঠে বসে বলে—তাতো জানিনা আজ্ঞে!

অবাক হয় প্রমথ—জানো না? কোথায় যাবে জানো না? নিজের নামটা জানো তো?

লোকটা জানায়—গজানন। বাপের নামটাও মনে আছে এখনও। বামুনের ছেলে। সবই জানি স্যার। এসেছি বাংড়ো জেলা থেকে, তবে দুনিয়ার কোথাও যাবার ঠিকানাটা আর জানা নাই।

প্রমথবাবু অবাক হয়ে দেখছে লোকটাকে। গজানন কি ভেবে বলে।

—এখানেই থাকতে ছ্যান না, একটা কাজ কর্মো যা হয় ছ্যান, করি।

প্রমথবাবু কি ভাবছে। নিজের কথাও মনে পড়ে। দুবেলা হাঁড় পুড়িয়ে রান্না করার যন্ত্রণাটা মনে হয়। তাছাড়া সস্তাগণ্ডার জায়গা, ওকে যদি আশ্রয় দেয় হয়তো প্রমথের নিজেরও একটা সমস্যার সমাধান হবে। তাই প্রমথ সবদিক ভেবে শুধোয়।

—রাঁধতে পারো? ধরো আমার বাসাতেই থাকবে, কাজকর্ম ওই রান্না করা। একা থাকি।

গজাননের শীর্ণ মলিন মুখে যেন আশার একটু আলো জাগে। গজানন বলে ওঠে।

—বামুনের ছেলের পুঁজি ওই তিন ফুঁ! কানে ফুঁ, শাঁখে ফুঁ আর উনুনে ফুঁ! মানে একটু এলেমদার হলে বামুনের ছেলে কানে মন্তর দিয়ে গুরুগিরি করে। তার থেকে নিরেস যারা, তারা ঘন্টা নেড়ে শাঁখ বাজিয়ে নারায়ণ পূজো, ইতু পূজো, মায় দুগ্‌গোপূজো তক করে; আব ওই দুকুলের বাইরে আমার মত অকূলে ভাসা বামুনের ঘরের মুখ্যু উনুনে ফুঁ দেয়, মানে রান্নাবান্না করে হাতা-খুন্তি নিয়ে। বড় কলমের কাজটা খুব পারবো স্যার! একবার ট্রাই করে দেখুন কেন্নে!

খুশির চোটে গজাননের শ্রীমুখ দিয়ে খাস্ বাঁংড়ি বুলি বের হতে থাকে।

প্রমথ জানায়—ঠিক আছে। ছ্যাখো যদি পোষায় করো।

প্রমথবাবুর বাসাতেই আস্তানা গাড়ে গজানন সেই দিন থেকে।

রূপসী সেদিন ওকে দেখে বলে—এটা কাকে আনলা গো বাবু? মড়ুই পোড়া চিমড়ে বামুনটা আবার কি করবেক?

রূপসী গজাননকে প্রমথবাবুর ঘরে দেখে খুশী হয়নি।

গজানন অবশ্য জোড় কলমের জাত। যে কোন মাটিতেই চট করে বসে যায়। এর মধ্যেই গজানন ক'দিনেই প্রমথের হাল ছাড়া সংসারের হালটাকে ধরে সামলে ফেলেছে। গজানন এদিকে হিসেবী।

রান্নাবান্নার কাজ ও ভালোই করে। খরচপত্রেরও হিসাব রাখে। তার জন্যই রূপসীর অসুবিধা হয়েছে। এতকাল রূপসীই প্রমথবাবুর সংসারের কাজ দেখার নামে আর রাতের খাবার দেবার বাবদ যা আদায় করে নিতো সেটা কম নয়। মেয়েটা বেশ সুযোগ সন্ধানী।

বাবুকে দুবেলা রান্না করে দেবার অজুহাতে এখানে ডাকাতি শুরু করেছিল। গজানন আসায় সেটা বন্ধ হয়েছে। গজানন জানে এই মেয়েটি তাই তার উপর আদৌ খুশী নয়।

গজানন অবশ্য মুখোমুখি সেই কথাটা বলে না, তবে বুঝতে পারে। তাই রূপসীকে চটাবার জন্যই সুর করে গেয়ে ওঠে।

—ওলো ও উপসী।

কিসের তরে নয়কো

তর মন খুসী।

নয়নভরা তোর ও রূপের কল্‌কেতে

প্রেম হুঁকোতে টান মারি ভাই।

রূপসী মুখ ঝামটে ওঠে—মরণ! তিনকাল যেয়ে এককালে ঠেকেছে, 'অস্‌' গেলনা!

রাগ করতে পারেনি মেয়েটা। গজানন বলে,—তবে নামখানা সার্থক তোর। রূপসী!

রূপসীর নামকরণটা নিয়ে অবশ্য অনেকেই অনেক কথা বলে। ওই নসু অবধি। রূপসীর কালো মুষকো চেহারায় পুরুষালী ভাব ফুটে ওঠে। কমনীয়তা নেই। নাকটা বোঁচা—আর চোখদুটো এইটুকু, সাদা দাঁতগুলো কালো মুখে হাসলে সারবন্দী বের হয়ে পড়ে, যেন বাঁদরে শাঁখআলু চিবুচ্ছে। আর গলার স্বরটাও খ্যানখ্যানে। রূপ তার ছিটে ফোঁটাও নেই। ওই নামটা তাকে মানায় না।

কিন্তু গজানন তাকে যেন সত্যিকার রূপসী বলেই স্বীকৃতি দিয়েছে, তাই রূপসীও মনের জ্বালা ভুলে একটু হাসার চেষ্টা করে। ছোট ছোট চোখ দুটোয় কুত কুতে তৃপ্তির আভাস জাগে। গজানন আসার দরুণ

প্রমথবাবুর সংস্থার থেকে তার চাল-ডাল-তেল-নুন এর আমদানীটা বন্ধ হয়েছে তাতে দুঃখ নাই। রূপসীকে যেন নোতুন একটা স্বীকৃতি দিয়েছে ওই হাসিখুশী মানুষটি। রূপসী তাতেই যেন খানিকটা তৃপ্তি পায়। লোকটার কথাবার্তাও ভালো। আর গানও গায়। এককালে যাত্রার দলেও গান গাইতো।

এমন এলেমদার লোকের চোখে রূপসী ছায়া ফেলতে পেরেছে। এই পরিচয়ে সে খুশী হয়েছে। কথাটা ভাবতে রূপসীর ভালো লাগে। তবু বলে ওঠে রূপসী।

—ধ্যাত্তেরি, তোমার ওই সব অং এর গান শুনলে গা পিত্তি জ্বলে ওঠে মাইরি।

গজানন হাসছে।

একটা কয়লা বোঝাই মালগাড়ি লাইনের উপর দিয়ে একটানা শব্দ করে চলেছে। ওগুলো এখানে থামে না। শব্দ তুলে চলে যায়।

রূপসী আনমনে ঘর-উঠোন ঝাঁট দিচ্ছে। রান্নার পাট না থাকলেও মেয়েটা প্রমথবাবুর কোয়ার্টারের এই কাজটা করে দেয় এখনও। ততক্ষণে গজানন চা-এর জল চাপিয়েছে। দরজাটা খোলাই থাকে, বাইরে কার ডাক শুনে রান্নার বারান্দা থেকেই সাড়া দেয় গজানন।

—কইগো, আয় ভেতরে। তোর পথ চেয়ে হা-পিত্যেশ করে বসে আছি। কখন আসবি—হিয়ে পরাণ একটু জুড়োবে।

ঢুকলো মেয়েটি, রূপসীও দেখছে ওকে। মেয়েটি বলে।

—মরণ। মুখে আগুন বুড়ো বামনার।

বেশ সতেজ সরস ভঙ্গীতে হাল্‌কা সুরেলা গলায় কথাগুলো বলে উঠোনে এসেছে তরঙ্গ। মাথায় দুধের কেঁড়ে। নিটোল দেহ, ক্ষারে কাচা ছোট ফর্সা কাপড়খানায় ওর অফুরাণ যৌবন যেন বাধা মানে না। গজানন বলে।

—রূপসী দুধটা নে, আমাকে দেখলে আবার একপো'র জায়গায় ভালোবেসে তরঙ্গ দুপোয়া দুধই ঢেলে দিবেক।

—ছাই দোব। তরঙ্গ হাসছে।

মেয়েটার ওই হাসি রূপসীর ভালো লাগে না।

চা হয়ে গেছে। ওরাও জানে গজানন তাদের জন্যও চা-এর জল দিয়েছে। তাই রূপসী আর তরঙ্গও বসে পড়েছে চায়ের গেলাস নিয়ে।

—বাবুকে চা দিই আসিরে।

গজানন একফাঁকে দৌড়ে ইষ্টিশনে এক গ্লাশ চা প্রমথবাবুকে দিয়ে এসে এবার নিজেও চা নিয়ে বসেছে ওদের সঙ্গে।

রূপসী ওই তরঙ্গকে যেন ঠিক সহ্য করতে পারে না। মেয়েটা বেশ মন ঢলানি গোছের। অবশ্য মুখে কিছু বলে না রূপসী।

তরঙ্গই বলে—মুখবুজে রইছো কেন গো রূপসীদি?

রূপসী কোনমতে জবাব দেয়—কই না তো।

গজানন শুধায়—চা কেমন হয়েছে রে?

তরঙ্গ চায়ে চুমুক দিয়ে বলে—ফাস্ কেলাস চা করেছো মাইরী।

রূপসী বলে ওঠে—তা চায়ের দোকানও তো দিতে পারো গ! লোকজন তো ঢের আসে ইখানে। শুনছি ওই পাহাড়ের দিকে নাকি বড় কল টলও বসবে, ইষ্টিশানে দোকান পশার নাই। এমন এলেম লিয়ে কি কেবল ভাতের হাঁড়িই ঠেলবা ইখানে?

কথাটা শুনে কি ভাবছে গজানন। মনে হয় কাজটা মন্দ হবে না। তাছাড়া দেখেছে লোকজনের যাতায়াত বেড়েছে। যাত্রীরাও আসে দূরের গাঁ থেকে। একটা দোকান পত্র নিয়ে বসতে পারলে তবু থাকা যাবে এখানে। আর জায়গাটাকেও ভালো লেগে গেছে তার। গজানন বলে—সে তো অনেক হাঙ্গামারে।

তরঙ্গ বলে ওঠে—চায়ের দুকান দিবা ঠাকুর, তা'লে দুধের খদ্দের বাড়লো বলো আমার। তা আমার থেকেই লেবা তো গ।

গজানন চা শেষ করে একটা বিড়ি ধরিয়ে লম্বা টান দিয়ে বলে।

—রাম না জন্মাতেই রামায়ণ গাইছিস। আমি দোকান দিলে মাষ্টার মশায়ের সংসার ঠেলবে কে?

হাসছে রূপসী। খবরটা সে নমুর কাছেই শুনেছে। এর আগে দুজন ভদ্রলোকও এসেছিল সকালের ট্রেনে, তারা নাকি খোঁজ-খবর নিতে এসেছিল। রূপসীও চায় রায়বাবু ঘর পাতুক, বামনাকে তাহলে যেতে হবে এখান থেকে।

রূপসী বলে—বাবু কি চেরকাল তোমাকে লিয়েই ঘর পাতবেক হে? শুনছি নোতুন বৌ আসবেক ইবার। বাবু বিহা করছে, কোন সহরে।

গজানন কথাটা শুনে একটু অবাক হয়। এতবড় খবরটা সে জানে না। তবু সেই বিরস ভাবটা চেপে বলে ওঠে,—ভালইতো। বিয়ে কেন করবে না?

রূপসী মনে মনে খুশী হয়েছে। গজানন তাকে এখানের প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত করেছে, এবার সেও যেতে বাধ্য হবে প্রমথবাবুর সংসার থেকে। গজানন বলে ওঠে।

—শুনছি নাকি তরঙ্গেরও বিয়ে হবেক এবার।

কথাটা শুনে তরঙ্গ চমকে ওঠে। ওর ফর্সা গালটায় একটু লাল আভা ফুটে ওঠে। ভয়ে আর লজ্জায়।

তরঙ্গের বিয়ে হয়েছিল কবে কোন কালে তা মনে পড়ে না। তরঙ্গের বাবা বনোয়ারীর অবস্থা এ চাকলার মধ্যে মন্দ নয়। বেশ কয়েকটা দুধেল গাই মোষ আছে। তার দুধও কম হয় না। তাছাড়া বনোয়ারী আরও দুধ কিনে নেয় অন্য গোয়ালাদের কাছ থেকে। সহরে যোগান দেয়। তারই গ্রামের ভজন ঘোষ বনোয়ারীর ওখানেই কাজ করে। রূপসী দেখছে তরঙ্গের বিবর্ণ চাহনিটা।

রূপসী বলে—কার সঙ্গে বিহা বটে গো?

ভজনের সঙ্গে তরঙ্গের মেলামেশাটা এদের অনেকের চোখে পড়ে। আজও তরঙ্গ এসেছে 'কদমাদ' নদীর ধারের পলাশ বনের পথে। ভজনও ঘুরপথে আসে ইষ্টিশানে। দুজনের দেখা হয় ছায়াঘন নদীর ধারে। তরঙ্গের সারা মনে সাড়া তোলে ভজনের সেই সান্নিধ্য আর

সহজ হাসিটুকু। গজাননও সকালে ওই নদীর দিকে যায়, সেই-ই দেখেছে ওদের দুজনকে। তরঙ্গের চোখের লহর তার চিনতে দেরী হয় নি।

কিন্তু তরঙ্গ জানে বিয়ে হবার কোন আশাই নেই আর তার জীবনে। সেখানে সব সুর ফুরিয়ে গেছে। কবে ছেলেবেলায় তার বিয়ে হয়েছিল দূর গাঁয়ে একটা বয়স্ক লোকের সঙ্গে। লোকটা বেশিদিন বাঁচেনি। বিয়ের সেই স্মৃতি তরঙ্গের জীবনে কি নিঃশেষ নিঃস্বতার বেদনায় বিবর্ণ হয়ে গেছে।

আজ তাই গজাননের কথায় কি অজানা ভয়ে শিউরে ওঠে ওই মুখরা মেয়েটা। তার আর ভজনের মধ্যে এই ঘনিষ্ঠতাটুকুকে সঙ্গোপনে রেখেছে তরঙ্গ।

গজানন দেখছে তরঙ্গকে। ওর সুন্দর মুখে বিবর্ণ বিনম্র ভাবটা ভালো লাগে গজাননের, রূপসী যেন ইচ্ছে করেই তরঙ্গকে আঘাত দিতে চায়। তাই শুধোয় গজাননকে।

—তা বিহা কার সঙ্গে হবে গো গজানন। সে দেখেছে তরঙ্গকে। তবু কথাটা চেপে বলে।

—দেখতেই পাবি! কি রে তরঙ্গ।

গজানন হাসছে। ওর ভালো লাগে তরঙ্গের এই সলজ্জ ভাবটুকু।

কিন্তু গজানন জানেনা তরঙ্গের জীবনের চরম বিপর্যয়ের খবরটা। ওই ভালোবাসা যে তরঙ্গের জীবনে দুঃসহ বেদনার এটা সে জানেনা। তাই হয়তো সেই ভালোবাসাকে সোচ্চার করে তুলতে চায় লোকটা। কিন্তু তরঙ্গ দাঁড়ালোনা, এই প্রসঙ্গ চাপা দেবার জন্যই উঠে পড়েছে তরঙ্গ।

ও বলে—কি আজে-বাজে কথা বলছো! চলি, দে গাঁয়ে দুধের রোজ দিয়ে ফিরতে হবেক।

তরঙ্গ বের হয়ে গেল। রূপসী ওকে দেখছে। মেয়েটাকে বের হয়ে যেতে দেখে ওর দিকে চেয়ে থাকে রূপসী। কালো মেয়েটার খুদে চোখ দুটো যেন জ্বলে ওঠে। গজাননের কথায় এইবার বলে রূপসী।

—বরাত পুড়িয়ে আবার রং ধরানো, সখ কতো ছুঁড়ির ! বিয়ে হবে না ছাই ! মরণ ।

গজানন চমকে ওঠে—কি বলছো গ ?

রূপসী বলে—জানোনা বুঝি ? মেয়েটাতো কড়ে রাঁঢ়ি গো। কচি বয়সে সব খেয়ে খিদে এখনও মেটেনি ওর। সাজগোজের বাহার ছাখোনা ? যেন ঢলে পড়বেক, ছোঁড়াটার মাথা খে'ছে !

চমকে ওঠে গজানন—ও বিধবা ! তাই নাকি !

গজাননের কথায় একটা বেদনার সুর বেজে ওঠে। ভেবেছিল তরঙ্গের জীবনেও সার্থকতা আসবে। সুখী হবে ওই নিরীহ ভালো মেয়েটা। কিন্তু এতবড় বেদনার খবরটা তার জানা ছিল না। গজানন নিজেই বিব্রত বোধ করে ওই সব কথা বলার জন্য।

রূপসী বেশ বিরক্তি ভরে ঝাঁট দিতে দিতে বলে।

—বিধবা ওই নামেই। বাকী আর কি আছে বলো ? আমি হলে গলায় দড়ি দিয়ে পলাশবনে ঝুলে পড়তাম। কি রূপের ছিরি !

গজানন সতী সাবিত্রী ওই রূপসীর রূপ সাগরের দিকে চেয়ে অবাক হয়। অবশ্য রূপসী জানেনা যে ত্রিভুবনে পুরুষদের কাছে সে নিরাপদেই থাকতে পারে ওই অবস্থায় পড়লেও। কিন্তু সে কথাটা বল্লে ওই ঝাঁটাই পিঠে পড়তে পারে, কারণ নসুর পিঠে ওই অস্ত্রটা দুচারবার ব্যবহৃত হতে দেখেছে সে। মনে মনে সমীহ করে গজানন ওকে। তাই সায় দেয় রূপসীর কথায়—তা সত্যি। তোমার সঙ্গে ওই তরঙ্গের তোলনা হয় কখনও ? কিসে আর কিসে ?

রূপসীর সাদা দাঁতগুলো বের হয়ে পড়ে খুশিতে। বলে ওঠে রূপসী কি ভেল্লে।

—তাহলে চায়ের দুকান-এর কথা বলবো লোকটাকে। একটা ঝুপড়ি বানিয়ে দিবেক ডাঙ্গার ধারে। দোকান ঘর হয়ে যাবেক তোমার !

অর্থাৎ নসুর তাড়ির দোকানের সঙ্গীদের বলেই রূপসী এই কাজটা করিয়ে দেবে, তাই জানাতে চায়।

প্রমথবাবু গজাননকে আশ্রয় দিয়েছে সত্যি, কিন্তু দেখছে লোকটা সৎ আর সুরদিকে ওর নজর। সংসারের খর্চাও কমে গেছে। কাঠ কয়লা কোন পথে যোগাড় করে তাও দেখেছে। কাঠের ঠিকাদাররাই কাঠ দিয়ে যায়। আর গজাননই যোগাড় করে আনে মাছ, ছানা, তরিতরকারী ওই মহাজনদের কাছে বিনাপয়সায়।

নস্থ গজগজ করে, কারণ এসব প্রমথবাবু নিতো না এতকাল। অবশ্য নস্থ মহাজন-পাইকেরদের কাছ থেকে ওই তরিতরকারী ছানা মাছ ডিম পেতো। আর বাজার থেকে কেনার খর্চা নিতো প্রমথবাবুর কাছ থেকে।

প্রমথবাবু খেতে বসে বলে—এসব পাও কোত্থেকে হে গজানন? পয়সাও নাও না; আসে কোত্থেকে?

গজানন বলে—আজ্ঞে বামুনকে দিয়ে যায় ওরা ভালোবেসে। পয়সাকড়ি নেয় না।

প্রমথবাবু আপত্তি করে—না না। এসব নেওয়া ঠিক নয়। দাম দিয়ো বাছা।

গজানন সেদিন ও কথাটা তুলেছে। প্রমথ ওর দিকে চাইল। গজানন বলে—তা বিয়ে থা করতে হবে তো। ওরা এসেছিল ওদের মত দিয়ে দেন বাবু।

প্রমথ কি ভাবছে। বকুলের মুখখানা এখনও ভোলেনি।

গজানন বলে—বিয়ে থা করুন বাবু, ঘর সংসার তো করতে হবে।

প্রমথবাবু বলে—দেখি। ভেবে দেখি।

সেদিন প্রমথবাবু গজাননের কথা শুনে চাইল। ক্রমশঃ কষ্টের জীবনটা থেকে থিতু হতে চায়, তাই মনে মনে কথাটা ভেবেছে প্রমথবাবু। বহরমপুরের সেই বকুলকে আজও ভোলেনি।

তার আপন জন বলতে আছে বহরমপুর শহরে এক দূর সম্পর্কের দিদি। দিদিই চেষ্টা চরিত্র করেছে তার বিয়ের। মেয়ের বাবাও

এসে দেখা-শোনা করে গেছেন এখানে। কথাবার্তাও এগিয়ে গেছে। গজাননের কথায় প্রমথ খাওয়া থামিয়ে বলে,

—নিজে তো ওসব করোনি, তবে অন্যকে ওসব কথা বলো কি করে হে?

গজানন এখন বাবুর সামনে বিড়িও খায়। তাই খাওয়া দাওয়ার পর হেঁসেলের পাট চুকিয়ে গজানন বিড়িটা ধরিয়ে বলে,

—আমি তো আর চেরকাল থাকছি না বাবু, হাত পুড়িয়ে রাঁধতে হবেক তা'লে আবার আপনাকে।

—মানে? প্রমথ অবাক হয়। গজানন যে চলে যাবে সেই কথাটা শুনে একটু ঘাবড়ে গেছে সে। তাই শুধোয়।

—তুমি আবার কোথায় যাবে হে?

গজানন বলে,

—দোকান করছি ওই চড়াই-এর মাথায়। বনোয়ারী ঘোষের জায়গা, ঘোষ মশায়ও দিবেক বলেছে, আর হাতে হাঁড়ি না পড়লে বিয়ে করবেন না—তাও বুঝেছি।

গজানন কি ভেবে বলে—আমার কথা বাদ দেন বাবু, ঘর সংসার বিয়ে থা—এসব আমার জন্যে না! তবু আপনি ঘর বাঁধুন। ছত্রভঙ্গ মানুষগুলো ডাঙ্গায় পড়ে আছি, লক্ষ্মী আসুক একজনের সংসারে।

প্রমথ অবাক হয়ে দেখছে ওই মানুষটাকে। লোকটার লোভ নেই—তাই মুখেও কিছু বাধে না। মনে হয় জীবনের অনেক বেদনা থেকে সঞ্জাত অভিজ্ঞতা ওর আছে। প্রমথবাবু বলে,

—তাহলে তো পথেই বসালে হে গজানন।

গজানন জবাব দেয়—পথে লয় বাবু, ঘরেই থিতু করে দোব।

গজাননও ক'দিন ব্যস্ত ছিল, ষ্টেশনের বাইরেই আমতলায় মাটির দেওয়াল দিয়ে ঘরখানা তুলছে। ঘোষ পাড়া—দেগাঁ—কিষনপুরের অনেকেই অসহায় লোকটাকে অযাচিতভাবে সাহায্য করে। বৃ

কাঠ—তাল গাছের কাঁড়ি এসেছে, বাবুই ঘাসের চাষ হয় উষর প্রান্তরে, তার দড়িও এসে গেছে অনেক। বাঁশ-খড়েরও অভাব হয় না। চাষী-বাসীর গ্রাম, তারাও সাহায্য করে খড় দিয়ে।

ভজন ঘোষও কাজের অবসরে তার বন্ধু-বান্ধবদের এনেছে ঘরখানা ছাইয়ে দিতে।

ইষ্টিশানের কাছে এবার দোকান হবে, একটা ঘরছাড়া লোককে তারাও প্রতিষ্ঠা করতে চায়।

গজাননের এদিকে কাজও বেড়েছে। রূপসী আর তরঙ্গও আসে, সকালে বাসায় চায়ের পাট তবু চালায় গজানন।

গজানন বলে—নোতুন বৌদি আসছে এবার তোরাই বসবি ঘর নিয়ে। আমি থাকবো দোকানে।

রূপসী বলে—বাবুর ঘর তো হবে, শুনছি গো। নোতুন বৌ আনবেক। আর তুমার?

গজানন বলে—সময় কই। বাবুর বিয়ের হাঙ্গামায় নাকদম হই গেলাম দেখছিস না?

রূপসী বলে—বাবুর বিয়ে হলে এবার তুমিও লেগে যাও। ঘরের আর দেরী কতো?

তরঙ্গ হাসে—কেনে গো, ঠাকুরের বালাখানা উঠছে দেখোনি? পঞ্চগেরামী লোক লেগেছে বাঠাউরের কোঠা বালাখানা গড়তে। ঘর হবে না?

রূপসী বলে ওঠে—মরণ বাঠাউরের তোর। রূপসী গতর নাড়িয়ে শোনায়।

মাগ নাই ছেইলা কাঁন্দে,
ঘর নাই আগড় বান্ধে! ঘরই হইল, বৌ কই?

গজানন বলে ওঠে—মনের মানুষ তো একজন ছিল রে, তাকে পেলে ঘর বাঁধতাম, তা তাকে তার আগেই একজন হরে লিয়েছে কিনা, তাই ঘর আমার শূন্যিই রয়ে গেল।

তরঙ্গ হেসে ওঠে—তা কে হরে নিল গ?

গজানন বলে—ওই ব্যাটা নন্দুরাম।

হেসে ওঠে তরঙ্গ খিলখিলিয়ে। রূপসী গর্জে ওঠে—মরণ! চিমড়ে বাম্‌নার কথা শোন না?

গজানন হাসছে।

হঠাৎ খেয়াল হয় অনেক কাজ পড়ে আছে। তাই তাড়া দেয়। —একটু বেরুতে হবে রূপসী। ন'টার ট্রেণ গেলে আঁচ দিয়ে দিবি। ফিরে আসবো ততক্ষণে।

গজাননের সামনে অনেক কাজ।

প্রমথবাবুকে সেও আশ্বাস দিয়েছে। বিয়ের ব্যাপারে কিছুই আটকাবে না।

প্রমথবাবু অবশ্য রাজী হয়েছিল, কিন্তু বাধাও দেখা দিয়েছে একটা। দিদি সহর থেকে জানিয়েছে মেয়ের বাবার এ বিয়েতে কোন আপত্তি নেই, কিন্তু খরচ সে করতে পারবে না। বরং বিয়ের খর্চা বাবদ সে হাজার তিনেক টাকা সাহায্য চায় হবু জামাই-এর কাছে। আর এটা খুবই লজ্জার ব্যাপার তাই যেন জানাজানি না হয়।

প্রমথ বেশ এগিয়ে গেছে। ছুটির দরখাস্ত করেছে। আর এখানে সহকারী ষ্টেশন মাষ্টার এসে গেছে, তাই ছুটিও মঞ্জুর হয়ে যায়। চারিদিকে কথাটা ছড়িয়ে পড়েছে। কেনাকাটাও করেছে, গহনাপত্রও কিছু গড়িয়েছে প্রমথ, এমন সময় বাড়তি ওই নগদ টাকাটার দাবী শুনে বিপদে পড়ে। এত সঞ্চয় তার নেই। এতদূর এগিয়ে বিয়ে হবে না এটাও লজ্জার কথা।

প্রমথের মনে হয় পরেশের ওদিকেই গিয়ে টাকাটা চাইবে তার কাছে। কিন্তু সেটাও পারে না। তাই ভাবনায় পড়েছে।

গজাননই শুধোয়—কি ব্যাপার বাবু? ভাবনায় পড়েছেন লাগছে?

প্রমথ ওই লোকটাকে কথাটা জানায়।

গজানন কি ভাবছে।

হঠাৎ মনে পড়ে বনোয়ারী ঘোষের কথা। লোকটার পয়সাও আছে। আর আছে অন্তর। তাকে ও শ্রদ্ধা ভক্তি করে। গজাননকে বনোয়ারী বলেছিল—পুঁজি কিছু নাও বাঠাউর। পাইকেরী দুধ-ছানার কারবার করো। চালান দাও মোকামে।

গজানন রাজী হয় নি। আজ তার কথা মনে পড়ে। গজানন বলে প্রমথকে—ওসব ভাববেন না। দেখছি আমি।

গজানন ঠাকুর অসাধ্য সাধন করেছিল। সে টাকার যোগাড়ও হয়ে যায়। এখনও অনেক কাজ বাকী। তারই যেন কন্যাদায়। গজানন সব গুছিয়ে নির্দিষ্ট দিনে প্রমথবাবুকে নিয়ে ট্রেণে উঠলো। যেন সেই-ই বরযাত্রী-বরকর্তা।

প্রমথ কি আশাভরা মন নিয়ে আজ চলেছে নোতুন জগতের দিকে। তার এতদিনের পুরোনো মনটার বোঝা ঠেলে নোতুন একটা সুর জাগে।

ক'দিনের মধ্যে প্রমথ বুঝেছে কোথায় একটা স্বপ্ন ছিল তার মনে, সেটা যে এত সহজেই সার্থকতার খুশীতে ভরে উঠতে পারে তা বিশ্বাসও করে নি।

বহুদিন ওই পলাশপুরের নির্জনতা থেকে কোথাও যায়নি বাইরে। বিয়ের ক'দিন বহরমপুরের পরিবেশ প্রমথের কাছে একটা পরিবর্তনের সাড়া আনে।

রুক্ষ বন্ধুর পার্বত্য পরিবেশের মানুষটা গঙ্গার রূপালী বালুচর, শ্যাম সবুজ রাজত্বে এসে শূন্য জীবনের মাঝে একটা মাধুর্যের সন্ধান পায়। নয়ত মনে হয় পলাশপুর একটা অজানা বিস্মৃত বিন্দু, সেখানে জীবনের এতগুলো বছর সব হারিয়ে কি নিয়ে বেঁচেছিল জানে না। নিজেকেই বঞ্চিত করেছে সে তিলে তিলে।

মেয়েদের কলরব ওঠে বিয়ে বাড়ীতে। রঙীন শাড়িপরা যৌবন-বতীর দল যেন রঙীন প্রজাপতির ঝাঁকের মত হাল্কা হাওয়ায় ভর

করে উড়ে চলেছে। প্রমথ সেজেছে নোতুন সাজে। এতকাল রেল কোম্পানীই যেন তার পোষাক জোগাবার ভার নিয়েছিল। পলাশপুরে দিনভোর সেই প্যান্ট আর পিতলের বোতামওয়ালা কোটগুলো চাপিয়েই থাকতো।

এখানে পরেছে দিশী ধুতি, গরদের পাঞ্জাবী। কে আবার গায়ে একটু বিদেশী সেণ্টও ছুঁইয়ে দিয়েছে। প্রমথ একসঙ্গে এত মেয়েদের দেখেনি।

ওরা যেন তাকে ঘিরে আজ কি সাজে সেজেছে, হাসির তুফান ওঠে।

একটি মেয়ে চাঁপা কলির মত আঙ্গুল দিয়ে ওর কপালে চন্দনের টিপ পরিয়ে বরণ করার সময় বলে ওঠে,

—অ পিসীমা, তোমার জামাইয়ের কপাল আর মাথার ডিমার্কেসন লাইনটা একটু আলাদা করে দেখাতে বলো। রাজ্যিময় যে টাক গো, কপালে চন্দন দোব কোথায়?

হাসির লহর ওঠে। প্রমথের মনে হয় পলাশপুরের প্রান্তরে যেন বসন্ত এসেছে। মাটির রং সেখানে লাল, সবুজ গাছ গাছালির ভিড়ে মাথা তুলেছে পলাশ-কেঁদ গাছগুলো। বসন্তের ছোঁয়ায় পলাশ বনে আগুন লাগে, রং-এর আগুন। মৌমাছির সাড়া জাগে, কোথায় ডেকে ডেকে হারিয়ে যায় পথহারা কোকিলের দল।

ওদের হাসিতে প্রমথ আজ স্বপ্ন দেখে, মিলনের স্বপ্ন। নিজের উপর নিজেরই রাগ হয়। আয়নায় নিজেকে এতকাল ঠিক দেখেনি। যদিও বা দেখেছে সে দেখার কোন বিশেষ অর্থ ছিল না। সে যেন আয়নায় অন্য কারো প্রতিবিম্বটা দেখেছে। আর দেহের লালিত্য সৌন্দর্য সেখানে ছিল অর্থহীন।

আজ মনে হয় প্রমথ ঠকে গেছে। জীবন তাকে একলা নিঃসঙ্গ অবস্থায় তার আনমনার সুযোগ নিয়ে বয়স রূপ আর তার যৌবনের গোনাগুনতি দিনগুলোকে চুরি করে সরে পড়েছে সঙ্গোপনে।

আজ তাই মাথাজোড়া চকচকে টাক—আর দেহের পরিধিটাও বাড়তির দিকে। গালে মাংসল ভাব হারানো যৌবনের খবরটাই ব্যক্ত করে চলেছে। এ এক বিচিত্র বেদনাদায়ক অনুভূতি।

উলুধ্বনি ওঠে। আলো ঝলমল পরিবেশ। প্রমথ নিজের সব হারানোর কথা ভোলবার চেষ্টা করে, ডাগর কালো চোখের দিকে চেয়ে থাকে। সলজ্জ আয়ত দৃষ্টি মেলে কে দেখছে তার দিকে দুচোখ মেলে। একটি মেয়ে, কপালে ওর কনে চন্দনের ছাপ, মাথায় ফুলের গহনা, নিটোল চাঁপাকলির মত আঙ্গুলে চেলিটা সরানো, সেই আয়ত দৃষ্টির একটু স্পর্শ প্রমথের চোখে, সারা মনে কি আবেশ আনে।

বকুলকে দেখেছে আজ নোতুন করে প্রমথ।

প্রমথের মনে হয় বকুলের ওই আশাভরা চাহনিতে হঠাৎ বেদনার কি গভীরতা জাগে। হয়তো বকুল আরও কিছুর প্রত্যাশা করেছিল। তার কুমারী জীবনের এত কালের দেখা স্বপ্নের সঙ্গে বাস্তবটুকুকে মিলিয়ে দেখতে গিয়ে মেয়েটি আজ চমকে উঠেছে। ওর চাউনিতে ফুটে উঠেছে বেদনার ছায়া।

বকুলের বাবা সামান্য কেরাণী। পর পর তিনটি মেয়ের বিয়ে দেবার পর বর্তমান অবস্থা তার শোচনীয়। বকুলও তা জানে।

কিন্তু স্কুল ফাইন্যাল পাশ করে কলেজে ভর্ত্তি হয়েছে, তার মনেও নিজের একটা স্বপ্ন ছিল। বকুল ভেবেছিল তার স্বামী হবে তরুণ কোনও অধ্যাপক, না হয় ভালো চাকুরে। কলকাতার ছেলে হলেই ভালো হয়।

নিজে গান শিখেছে বকুল চেষ্টা করে। গান ও ভালো গায়, তার জন্য ছোট্ট শহরের অনেক অনুষ্ঠানে তার ডাক পড়ে। বকুলও দেখেছে তার সুরের মায়ায় এখানের অনেকের চোখে কি আবেশ জাগে। নিজের যে একটা মূল্য আছে অনেক পুরুষের চোখে তা দেখেছে বকুল, আর পুরুষের সেই নীরব স্তাবকতায় মনে মনে খুশীই হয়েছিল সে।

তাই স্বপ্ন দেখেছিল কলকাতায় ঠাঁই পাবে সে, সেখানে রেডিওতে গাইবে। রেকর্ডিংও করবে। নিজেকে প্রকাশ আর প্রচার করার একটা পথ পাবে। সেই সঙ্গে একটি ঘর পাতবে নিজের মনের মাধুরী দিয়ে, একজনকে ভালোবেসে সার্থক হবে সে।

কিন্তু বকুলের বাবার সেই সামর্থ ছিল না। বদনবাবু চেয়েছিল মেয়ে মোটামুটি একটু ভালো জায়গায় পড়ুক। সেদিক থেকে প্রমথ পাত্র হিসেবে তেমন খারাপ নয়, বড় কথা দাবী দাওয়া তার নেই তেমন কিছু। আর রেলের চাকরী, কোয়ার্টার আছে। বদনবাবু জানে বকুল একটু স্বাধীনচেতা মেয়ে, তাব স্ত্রীর কথায় বদনবাবু ওর দিকে চাইল। বকুলের মায়ের ঠিক পাত্র পছন্দ হয় নি তাই কথাটা অন্যভাবে জানায় সে।

বকুলের মা বলে—মেয়েকে ওই বনবাসে পাঠাবে? শুনেছি একেবারে মানে বনপাহাড়ের ধারে অজ পাড়াগাঁ। লোকজনও নেই। মেয়েতো সহরে মানুষ, থাকবে কি কবে গো সেখানে বনবাসে?

বদনবাবু জানে মেয়েদের মন সহজে ভবে না। ওদের চাওয়ার সীমা অনেক। তাছাড়া একটু ভালো পাত্র খুঁজতে গেলে এইবার বসত বাড়িটাই বিক্রী করতে হবে। ওরা সে খবর রাখে না। মিছিমিছি পাত্র বাছাবাছিই কবে তারা।

তাই বিরক্তি চেপে স্ত্রীর কথায় বলে বদনবাবু,

—মেয়েতো একবগ্‌গা। শ্বশুর শাশুড়ী ননদ জায়েব বেড়াজালে পড়লে ঘর করতে পারবে? এ তবু স্বাধীন। নিজের বাসা গড়ে তুলুক। আর ওর পলাশপুরের কথা বলছো? প্রমথের বদলির চাকরী। ওখানে কি চিরকাল পড়ে থাকবে প্রমথ? সহরেও তো হতে পারে। তখন সহরেই থাকবে আবার।

বকুলের কানেও কথাগুলো গেছে। বাবা মায়ের কাছে সে এখন বোঝা হয়ে উঠেছে। তাই যেভাবে হোক তাকে যেন কাঁধ থেকে

নামিয়ে ওরা দায়মুক্ত হতে চায়। বকুল তাই মাকেই জানায়—এমন বিয়ে থা দিয়ে দরকার কি বাপু। তার চেয়ে আমাকে নিজের পায়ে দাঁড়াতে দাও। দু'একটা বছরের মধ্যেই পাশ করে বেরুবো। চাকরীই নোব।

বদনবাবু মেয়ের কথায় বলে ওঠে—ওটা পরে ভেবো, আমি মরে গেলে। এখন যা ঠিক করছি মেনে নিতে হবে।

বকুলের নীরব মনে তাই বিদ্রোহের জ্বালাটা আপাততঃ চাপা, মুছে যায় নি। বরং যেন অতলে আরও খানিকটা উত্তাপের উষ্ণতা নিয়েই টিঁকে ছিল।

মুখ বুঁজে আজ সে বিয়ের অনুষ্ঠানগুলোকে মেনেছে মাত্র, অন্তর থেকে সাগ্রহে তাকে বরণ করে নিতে পারেনি বকুল। শুভদৃষ্টির মুহূর্তে তাই চমকে উঠেছিল প্রমথকে দেখে। তার স্বপ্নের নিঃশেষ সমাধি ঘটেছে, তারই নীরব বেদনা জাগে ওর সারা মনে, দু'চোখে। প্রমথের চেহারার মধ্যেও আকর্ষণীয় কিছু নেই যা চোখে পড়ে। নীরস বোকা-বোকা চেহারার লোকটা তার দিকে চেয়ে আছে নির্লজ্জ চাহনি মেলে।

হাল্কা চেলির ঢাকার নীচে ওরা দুজনে দুজনকে দেখছে। বকুল কি বেদনাভরে চাহনিটা নামিয়ে নেয়! তার চোখে ফুটে উঠেছে নীরব একটা হতাশার কাঠিন্য। উৎসবমুখর পরিবেশ ওই উলুধ্বনি আর শাঁখের শব্দ যেন বকুলের বেদনার্ত দীর্ঘশ্বাসকে নিঃশেষে চেপে গিয়েছে। প্রমথ বকুলের মনের অতলের এই হাহাকার আর যন্ত্রনাটাও ঠিক বোঝে না, তবু মনে হয় তাকে ঠিক মেনে নিতে পারেনি ওই মেয়েটি।

গজানন এসেছে প্রমথের সঙ্গে। আর এসেছে প্রমথের সদর রেল অফিসের দু'একজন পরিচিত ভদ্রলোক। তারাই বরযাত্রী, আর এখানের দিদির পাড়া থেকে দু'একজন এসেছেন। প্রমথের কাছে গজাননই রয়েছে সবসময়।

এখানে গজাননের পোষাক পত্রও আলাদা। যাযাবর লোকটার পরণে ধুতি, সাদা মার্কিনের পাঞ্জাবী। গজানন পাশেই দাঁড়িয়েছিল শুভ দৃষ্টির সময়, সেও দেখেছে নোতুন বৌ-এর চোখের সেই হতাশার কাঠিন্য। তবু গজানন বলে বকুলকে,

—চোখ তুলে চাও, এ সময় চাইতে হয়।

বকুল যেন কথাটা শোনেনি এমনি ভাব নিয়েই রইল চোখ নামিয়ে।

অবশ্য তাতে অনুষ্ঠানের কিছুই ক্রটি হয় না। ওটা লোকাচার মাত্র। বকুলের নীরব প্রতিবাদেও কেউ এরা আগেও কান দেয় নি। তারপরেও দেবার প্রয়োজন বোধ করে না।

বাসরের হাসি গানের অনুষ্ঠানেও ভাঁটা পড়ে না, বরযাত্রীদের আপ্যায়ণেরও ক্রটি হয় নি। তাই শুভ বিবাহ পর্ব নিরাপদেই চুকে যায়।

প্রমথ দেখছে বকুলকে। শান্ত সংযত মেয়েটির মুখে একটা কমণীয়তা রয়েছে। খুব ফর্সা নয়—মাজা মাজা রং। আর তাই যেন কোমল বোধ হয়। চোখদুটো সুন্দর—টিকলো নাকের ধারালো আদল ওর মুখে বুদ্ধিদৃপ্ত মার্জিত একটা ভাব এনেছে। বকুলকে হাসতে দেখেনি। মনে হয় হাসলে ওকে সুন্দরই দেখাবে।

উৎসবের পালা শেষ হয়েছে। এবার বিদায়ের পালা। প্রমথও এখানের কাজ শেষ হবার পর যাবার কথা ভাবছিল—গজানন জানায় —গোছগাছ হয়ে গেছে। কাল সকালের গাড়িতেই বের হবো।

কদিনের মধ্যেই সময়ের গোনা-গুনতি ছুটির দিন ফুরিয়ে আসছে। সহরের এই পরিবেশ ছেড়ে ফিরতে হবে প্রমথকে পলাশপুরের নির্জনতার মধ্যে।

প্রমথ বকুলকে শুধোয়—গান গাও শুনেছি।

বকুল ওর দিকে চাইল। মনে হয় বকুলের গান গাওয়ার খবরে লোকটা খুশী নয়। বকুল তাই যেন জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে ওর দিকে চেয়ে থাকে।

প্রমথও সেই চাহনিতে নীরব কাঠিন্য দেখে নিজের প্রশ্নের ভুলটা যেন বুঝতে পেরেছে। প্রমথ দেখেছে ওই মেয়েটির মনে একটা প্রতিবাদের কাঠিন্য কোথায় রয়ে গেছে। প্রমথ বলে,

—গিয়ে ওখানেও গাইতে পারবে। কালই যাচ্ছি আমরা। অর্থাৎ যেন সান্ত্বনা দিচ্ছে বকুলকে।

বকুল ম্লান একটু হাসল মাত্র, জানে বকুল সব তার হারিয়ে যাবে। আজ সারা মনে ওর হারাবার বেদনা জেগে ওঠে। যাবার বেলা চোখের জল বাধা মানে না বকুলের।

তবু সয়ে যেতে হবে। বকুল এই কঠিন শাস্তিটাকে যেন মাথা পেতে নিতে বাধ্য হয়েছে। নিজের কাছে নিজেকে আজ পরাজিত বলে বোধ হয়। এতদিনের জীবন থেকে এই নির্বাসনকে মেনে নিতে হয় বহু বেদনায়।

ট্রেণের পথটাও সোজা নয়। কাটোয়া থেকে ছোট লাইনের গাড়িতে বর্দ্ধমান ঘুরে বড় গাড়ি বদলে আসানসোল জংশন ষ্টেশনে রাত ভোর পড়ে থাকতে হয়। সেখানে ভোর রাতের অন্য গাড়িতে উঠে চলেছে এবার পলাশপুরের দিকে। বকুলের মনে হয় বাবা তাকে জেনে শুনেই এমনি দূর পথে পাঠিয়েছে, সেখান থেকে ফেরার যেন তার কোন উপায় আর না থাকে।

মনে মনে বকুলও ক্রমশঃ ধৈর্য হারিয়ে ফেলছে। তবু নীরব চাহনি মেলে দেখছে নোতুন ওই দিগন্তকে। কালো কালো পাহাড় আর বনরাজ্য।

বকুলের সব অতীত কোথায় ওই দূর সীমাহীন শূন্যতার মাঝে হারিয়ে গেছে। সে যেন তার নিজের সব কিছু পরিচয়ও ভুলে গেছে এই বিস্তীর্ণ সীমাহীনতার মাঝে। অবাক হয়ে বকুল ওই বিচিত্র জগতের দিকে চেয়ে থাকে। চারিদিকে তার বনরাজ্য, পাহাড় কখনও দেখেনি সে। তাই শুধোয় প্রমথকে,

—ওগুলো কি? পাহাড়? না?

প্রমথ দেখছে বকুলকে। পথের ক্লান্তিতে ওর চুলগুলো কপালে এসে পড়েছে, মুখ-চোখে রাত জাগার রুক্ষতা ওকে যেন আরও সুন্দর করে তুলেছে। ডাগর দু'চোখে কি নীরব ভয়, কৌতূহল মেশানো।

প্রমথ সহরের সেই পরিবেশে বকুলকে ঠিক চিনতে পারেনি, সেখানে বকুল ছিল স্বতন্ত্র, দূরের মানুষ। এখানে এসে ক্রমশঃ যেন আরও কাছে এসেছে বকুল। তার উপর নির্ভরশীল হয়ে উঠেছে। প্রমথ বলে,

—হ্যাঁ, পাহাড়। একদিন ওদিকে বেড়াতে যাবো, ভারি সুন্দর জায়গা।

বকুল ক্লান্ত স্বরে শুধোয়—পলাশপুর আর কতদূর।

বকুলের চোখের সামনে টিলা প্রান্তরগুলো জেগে ওঠে, মাঝে মাঝে পলাশের বন, ওদিকে শাল বনে এসেছে কচি পাতার সমারোহ, নীচ দিয়ে বয়ে চলেছে ছোট্ট নদীটা, রূপালী বালির বুকে কাঁচ ধার জল বয়ে চলেছে। প্রমথ জানায়—সামনেই পলাশপুর।

বকুল চমকে উঠে পলাশপুরের দিকে চাইল। জনবসতের কোন অস্তিত্বই নেই—শুধু কঠিন লাল প্রান্তর আর পলাশবন।

এই তার বনবাসের জায়গা। শান্ত ছোট্ট ইষ্টিশান প্লাটফর্মের দুদিকে উঠে গেছে চড়াই, লাইনটা এখানে অনেক নীচে, দুদিকে উঁচু ডাঙ্গার সীমানা, ট্রেনটা স্টেশনে থামতে ওরা নামল। বকুল চারি দিকে সন্ধানী চাহনি মেলে দেখছে।

ষ্টেশনে এসেছে রূপসী, আর তরঙ্গও আসে সকালে দুধ নিয়ে, তরঙ্গও নোতুন বৌদিকে দেখার জন্য এসেছে। ওদিকে দুধের বাঁক নিয়ে ষ্টেশনে রয়েছে দুধ যোগানদারের দল। বনোয়ারী ঘোষও এসেছিল কি কাজে। প্রমথবাবুকে নামতে দেখে ওরাও এগিয়ে যায়। এ্যাসিস্টান্ট ষ্টেশন মাস্টার নিখিলও গেছে। মালপত্র নামানোর তদারক করছে গজানন।

রূপসী এগিয়ে যায়, নস্থ পোর্টার, করম পয়েন্টস্‌ম্যানও এসেছে। মালপত্র নামাচ্ছে। বকুল দেখছে তার নোতুন জগৎকে। রূপসী বিশাল দেহ নিয়ে টিপ করে প্রণাম করে, তরঙ্গও।

গজানন বলে—ওই রূপসী ! মানে নামটাই।

বকুল হেসে ফেলে। অবশ্য বকুল বুঝেছে রূপসীর নামটাই ওর কাছে ব্যঙ্গের মত। তবু সহজভাবে বলে,

—এখানেই থাকো বুঝি ?

তরঙ্গ দেখছে নোতুন বৌকে। দু' চোখে ওর খুশীর আবেশ। মনে হয় মেয়েটি দেখতে সুন্দরই। তার তুলনায় প্রমথবাবুই বেমানান।

গজানন হাঁক ডাক শুরু করে—নে, মালপত্র নিয়ে চল কোয়ার্টারে। দু' রাত ঘুম নেই। উঃ কুন মুলুকে গিইছিলাম রে ?

মনে হয় গজাননের কোন অশান্তির জায়গা থেকে শান্ত পরিবেশে নিজের জগতে ফিরেছে তারা।

বনোয়ারী ঘোষকে দেখে প্রমথবাবু এগিয়ে যায়।

—ঘোষ মশাই।

বনোয়ারী ঘোষ এখানের সঙ্গতিপন্ন লোক। অবশ্য দেখে বোঝার উপায় নেই। পরনে হাঁটু অবধি ধুতি, গায়ে একটা ফতুয়া, গলায় তুলসীর মালা, সঙ্গে দু চারটে সোনার নকল দানাও গাঁথা আছে।

বনোয়ারী বলে—এলাম, মা জননীকে দেখে গেলাম। কাজও ছিল। লোকগুলোর টিকিট কাটতে এসেছিলাম।

বনোয়ারীর ওই দুধবাহক বাহিনীর জন্য বেশ কয়েকটা ভেণ্ডারের টিকিট কাটতে হয়। ইদানীং ছানাও পাঠাচ্ছে সে। বনোয়ারীর ইচ্ছে আছে একটা ডেয়ারীই করবে ভালো করে।

নোতুন সহকারী ষ্টেশন মাষ্টার নিখিলবাবুও ট্রেণ পাশ করিয়ে এসেছে এইবার। বলে ওঠে নিখিল,

—তাহলে ফিরলেন জোড়ে। এখন সময় নেই, বৌদির সঙ্গে পরে গিয়ে আলাপ করবো। যান দাদা, কোয়ার্টারে যান।

বনোয়ারী বলে—আর যাবেন কোথা, এইবার এখানেই তো রইলেন গো। যাই বাবু, পরে আসবো। প্রাতঃ পেন্নাম।

প্রমথ বকুলকে নিয়ে চলছে বাসার দিকে। বকুল দেখছে নোতুন এই জগৎকে।

বনোয়ারী ঘোষ গ্রামের দিকে চলেছে। ঢালু ক্রমনিম্ন জমি, এক কালে এখানে গভীর বনই ছিল, এখনও এদিক ওদিকে ছড়িয়ে আছে বনঢাকা টিলাগুলো। বসতির পাশের ক্রমনিম্ন জমির ঢালুতে এখন গ্রামের লোকজন চাষ আবাদ করছে, আর উপরের দিকের বিস্তীর্ণ চড়াই এখনও বন্ধ্যা, অনুর্বর। ধূ ধূ করছে শীতের শেষে। নির্জন নিঃসঙ্গতা বিরাজ করে ওখানে। বনোয়ারী সদরে শুনেছে ওই বিরাট ডাঙ্গায় নাকি বিজলীর কারখানা বসবে। কিন্তু শুনেই আসছে। দু'একবার জরিপও হয়েছে। কিন্তু কাজ সুরু হয়নি এখনও। ষ্টেশন থেকে বের হয়ে বনোয়ারী আনমনে চলেছে। মাঠে লোকগুলো লাঙল দিয়ে তিল-তুলসি ছড়ানোর কাজে নেমেছে।

বনোয়ারী চড়াই-এর মাথায় একটা জিপ দেখে থামলো। রাস্তা ঘাট এর দরকার হয় না ওই গাড়ির। গরুর গাড়ির আট ধরেই চলবে, এবড়ো খেবড়ো মেঠো সড়ক হলেও ক্ষতি নেই।

এই বিস্তীর্ণ প্রান্তরে নাকি কোন কারখানা গড়ে উঠবে। বনোয়ারী আগে থেকেই এদিকে কিছু সম্ভাবনার কথা জেনেছিল। তাই জিপটা থেকে কাদের নেমে ওদিকে ঘোরাঘুরি করতে দেখে চাইল।

বনোয়ারীর ওই বিস্তীর্ণ ডাঙ্গার কিছুটা ইজারা নেওয়া আছে।

দু' একজন লোক কি সব কম্পাস দূরবীন লাগিয়ে দেখছে, এক জনের হাতে কাঠের রং করা একটা খোঁটা। দূরবীণে চোখ লাগিয়ে দেখছে তারা আর কি সব লিখছে।

বনোয়ারী ওদের দিকে এগিয়ে যায়।

কয়লা কুঠির এলাকা এখান থেকে দূরে নয়। কয়েক মাইল দূরেই

দামোদর নদী গভীর খাদের মধ্য দিয়ে বয়ে চলেছে, ওর দুদিকে উঁচু পাহাড় মত, পাথরের বেষ্টনী ভেদ করে দামোদর বয়ে গেছে এখানে, ওই পারেই সুরু হয়েছে কয়লা খনির এলাকা। ওদিকে বড় বড় কোলিয়ারী রয়েছে। কিন্তু প্রকৃতির এমনি নিয়ম যে কয়লার সব স্তরের সীমানা ওই নদীর ওপারেই সীমিত, এদিকের মাটিতে আসেনি। তবু নদীর জলও রয়েছে। কাছাকাছি কয়লা রয়েছে—নাগালের মধ্যে, তাই এখানে গড়ে উঠছে বিজলী কারখানা, ভদ্রলোক বনোয়ারীকে জানায়—থার্মাল প্ল্যাণ্ট হবে। বিজলী তৈরী হবে এখানে। তারই কারখানা হচ্ছে।

বনোয়ারী বলে—ওতো শুনছি স্যার ঢের দিন থেকে। কই কিছুই হল না এখনও।

একটি যুবক মাথায় রোদ এড়াবার জন্য হ্যাট পরে কি লিখছিল, সে বলে—বৃহৎ ব্যাপার, সবদিক দেখতে হবে তো? লোকজন থাকার কলোনী, রাস্তা ঘাট নোতুন রেল্ লাইন বসবে ওয়ার্ক সাইট অবধি, তবে তো কাজ সুরু হবে। আর দেরী হবে না এবার।

বৃদ্ধ বনোয়ারী যেন স্বপ্ন দেখছে, এই জন হীন প্রান্তর একদিন লোকজনের ভিড়ে ভরে যাবে, রাস্তাঘাট দোকান-পশার হবে, কারখানা বসবে।

পলাশপুরের জীবনের সঙ্গে বনোয়ারীর প্রায় পঞ্চান্নটা বছর জড়িয়ে আছে। সে-ই দেখেছে এখানে ঘন বন, কদমদহের নদীর ধারে দিনের বেলাতেও লোকজন কেউ আসতো না, বাঘ-চিতাবাঘ-ভালুকও দেখেছে এখানে। বনশূয়োর অবশ্য এখনও আছে—হেড়োল আধবাঘার খবরও মেলে। এসব জগৎ একবারে বদলে যাবে।

ক্রমশঃ ইষ্টিশান বসেছে, লোকজন কিছু যাতায়াত করে। নাহলে পলাশপুর আপন নির্জনতার স্বপ্নেই বিভোর হয়ে থাকে দিনরাত। বনোয়ারীর মনে হয় ওই নির্জনতাই ছিল ভালো। ওই সুন্দর—খোলা মেলা—সবুজ আর শান্ত জগৎটাই ভালোলাগে তার।

কিন্তু এ সব কিছুই হারিয়ে যাবে।

বনোয়ারী আলপথ ধরে চলছে। ওপাশে বিষণপুরের ডিহির পর নদী পার হয়ে পলাশ-আঁটাড়ি বনের ওদিকে তাদের গ্রাম। গরুগুলো চরছে, শালপলাশ বনের আড়ালে মেষগুলোকে দেখা যায় না, স্তব্ধতার মাঝে ওদের গলার কাঠের ঘণ্টা বাজে—ঠরর-ঠরর।

কোথায় একটা ফিঙে ডাকছে, তিতির পাখীদুটো তাকে দেখে উড়ে গেল ফর ফর করে। বনোয়ারীর মনে হয় এই শান্তিই ভালো। ওই কল-কারখানা-গাড়ি-লোকজন সব যেন বদলে দেবে এই পলাশপুরকে। এখানের মানুষগুলোকেও। হয়তো তখন সে থাকবে না।

কোথায় রাখাল-বাঁশীর সুর ওঠে—আদিবাসী কোন রাখাল বেউল বাঁশের বাঁশীতে ফুঁ দিয়ে চলেছে। সুরটা ওই বুনো পরিবেশের মতই পরিচয়হীন, হয়তো বেসুরো। তবু মিষ্টি লাগে।

কদমদহের নদীর ধারে দাঁড়ালো বনোয়ারী। ওরই ওদিকে সে গোশালা করতে চায়, জলের অভাব হবেনা, আর নীচু সোল জমিতে গরু মোষগুলো চরাণ পাবে, বনোয়ারী কারবার বাড়াতে চায়।

কিন্তু তার ছেলে কিশোরী আর মদনই এই নির্জন গ্রাম বনপাহাড়কে যেন সহ্য করতে পারে না। তারা সহরের স্বপ্ন দেখে। বলে তারা,

—ইখানে কিছু হবেক নাই। সহরেই দোকান দোব, ব্যবসা করবো। আর আমদানীর বাজার তো সেখানেই বেশী।

মদন একেবারে বাবু হয়ে গেছে আর বড় ছেলে কিশোরী বদলে গেছে ওর বৌটার পাল্লায় পড়ে। বনোয়ারী জানে তার সব বাড় বাড়ন্ত আর আমদানীর মূল এই গ্রামেই রয়ে গেছে কিন্তু ছেলেদের মতলব দেখে বুড়ো আদৌ খুশী নয়। দেখেছে ছেলেগুলো সহরে গিয়ে গিয়ে যেন বদলে গেছে। আর বৌ দুটোও তেমনি। বনোয়ারীর এই পলাশপুরের স্বপ্নকে তারা ব্যঙ্গ করে। তার আড়ালে ছেলেবৌরা আলোচনা করে—বুড়োর ভীমরতি হয়েছে, নাহলে এই বনে জঙ্গলেই পড়ে থাকতে চায়,

কিশোরীও গজগজ করে—যা বলেছো।

বনোয়ারী এসব কথা শুনেছে। কিন্তু কোন প্রতিবাদ করে নি।

বুড়োর বুকের অতলে একটা বেদনা লুকিয়ে রয়েছে, আর সেখানে সে দুর্বল। দুঃখটা ওই তরঙ্গের জন্য। ওর কথা ছেলেরা, ছেলেদের বৌ-রা কেউ ভাবে না।

বেলা হয়ে গেছে। পলাশের পাতা ঝরছে—এবার বনে বনে আসবে লাল ফুলের আগুনে আভা। রোদও তেতে ওঠে। বনোয়ারী মাঠে লাঙ্গল ছেড়ে মুনিষগুলোকে আলের মাথায় বসে গল্প জমাতে আর তামাক খেতে দেখে বলে,

—এই করছিস তোরা? এখন থেকেই গা তেতে গেল তোদের? মাঠের কাজকর্ম দেখার কথা তার ছেলে মদনের। মদনও ত্রিসীমানায় কোথাও নেই। ছেলেটাও মাঠের কাজ দেখতে আসে না। রোদে নাকি কষ্ট হয় তার। আর মুনিষজনরা তাই এইভাবে ফাঁকি দেয়। বনোয়ারীও বুঝেছে সেটা।

মুনিষগুলো বুড়োকর্তাকে দেখে অনিচ্ছাসত্ত্বেও তামাকের মৌজ ছেড়ে উঠে পড়ে মাঠে নামলো। বনোয়ারী দেখছে ওদের। আবার কাজ সুরু হয়। কিন্তু জানে বনোয়ারী, হলা গেল ঘর, লাঙল তুলে ধর। বনোয়ারী এগোলেই ওরা আবার বসে পড়বে হাতের কাজ ফেলে রেখে, তামাক খাবে।

মরুকগে। এখন বয়স হয়েছে তাই বনোয়ারীর রোদে কষ্ট হয়, ছেলেদের ব্যাপার ছেলেরা বুঝুকগে। এই ভেবেই বাড়ির দিকে এগোলো সে।

তরঙ্গ সকালে দুধের রোজ সেরে বাড়ি ফিরেছে, এটা তার প্রাত্যহিক কাজেরই অঙ্গ। তবু বদ্ধ বাড়ির পরিবেশ থেকে তরঙ্গ কিছুক্ষণ মুক্তি পাবে এই কাজের মধ্যে। ষ্টেশনের নোতুন বৌদি বকুলকে

তার ভালো লাগে। আর পথের বাঁক থেকে চেয়ে দেখে ভজনকে। তরঙ্গের এই ক্ষণিক মুক্তিটুকু তাই স্বপ্নভরা। বাড়ি ফিরে নানা কাজে ব্যস্ত থাকে তরঙ্গ। মাঠে মুনিষজন খাটছে।

মদনের খেয়াল নেই, সে নোতুন সাইকেল কিনেছে—তাই নিয়ে ব্যস্ত। ছোট বৌ কালী তরঙ্গকে দেখে বলে—মুড়িগুলো মাঠে দিয়ে এসো ঠাকুরঝি।

তরঙ্গ জানে এ বাড়িতে ঝিয়ের মতই খাটতে হয় তাকে।

বড় বৌদি বাসিনী ওদিক থেকে হাঁক পাড়ে—একগাদা শাড়ি ক্ষারে দিইছি ঠাকুরঝি। একটু কাচতে হবে।

তরঙ্গ জানে ওরা কেউ কাচবে না, তাকেই কাচতে হবে। কষ্ট হয়।

তরঙ্গ তাই বলে—মাঠে মুড়ি দিতে যাচ্ছি, ওগুলো কামিনকে বলো কেচে দেবে, নাহয় তোমরাই হাতে হাতে কেচে নাও ভাজ বৌ।

বাসিনী একটু বেশী আয়েসী, সহরে ওর বাবার মিষ্টির দোকান আছে। সহরেই মানুষ। তাই বোধ হয় মেজাজটাও গরম। তরঙ্গের জবাবে বাসিনী বলে ওঠে—মুখে মুখে জবাবও বেশ দিচ্ছো দেখছি। ওইতো কাজ, সারাদিন করো কি?

তরঙ্গ একটু অবাক হয়, ওদিকে মদন নিজের খাটুনি বাঁচাবার জন্য মুড়ির টিনটা ধরিয়ে দিয়েছে তরঙ্গের হাতে। তরঙ্গ বলে—দুটো তো হাত ভাজ বৌ। দ্যাখ তোমরা, কি কাজ করি দিনভোর।

মুড়ির টিন নিয়ে বের হয়ে গেল তরঙ্গ। জানে এইবার বড় বৌ এই ব্যাখানা সুরু করবে। তরঙ্গ যেন ক্রমশঃ এ বাড়ির পরিবেশটাকে আর সহ্য করতে পারছে না। কিন্তু যাবারও ঠাঁই নেই। তাই মুখ বুঁজেই তাকে ওদের সব কথা সইতে হয় আর খাটতে হয় তাকে সবচেয়ে বেশী।

রোদে চলতে কষ্ট হয় তরঙ্গের। সকালে দুধ নিয়ে বেশ কিছুটা হেঁটে এসেছে।

সামনে বাবাকে দেখে চাইল। বাবা মাঠ থেকে ফিরছে বাড়ির দিকে।

বনোয়ারী দেখেছে তরঙ্গের প্রতি ওই ছেলে বৌদের ব্যবহার। তবু বনোয়ারী অবাক হয়—ওরা কেউ নাই? তুই এলি মুড়ি নিয়ে? মাঠে যাবি এই রোদে?

মাঠে মজুরদের জলখাবার পাঠাতে হয়। বনোয়ারী দেখেছে ছেলেরা এ কাজটুকুও ওর ঘাড়ে চাপিয়েছে। নিজেরা কিছুই করবে না।

বাবার কথায় তরঙ্গ জবাব দেয়—ওদেরই শুধোও গে। রোদ বেড়েছে, পথে পথে ঘুরো না, আমি মুড়িটা দিয়ে ফিরছি। যাও বাড়ি গিয়ে জিরোও গে।

বনোয়ারীর দিকেও ওদের কারো নজর নেই। বুড়ি মারা যাবার পর থেকে দেখেছে বনোয়ারী—ছেলে-বৌদের তার প্রতি যেন কোন কর্তব্যই নেই, শুধু ওই দুইয়ে নেওয়া ছাড়া। তরঙ্গই তবু তাকে দেখাশোনা করে, বাবার কথা ভাবে।

বনোয়ারী বাড়িতে পা দিয়ে দেখে মদন নোতুন সাইকেলটা মুছছে, আর কিশোরী বাইরের ঘরে একটা মেয়েছেলের ছবিওয়ালা বই-এর পাতা ওলটাচ্ছে। বনোয়ারী দেখেছে ইদানীং গঞ্জে শহরের ইষ্টিশানের বই-এর দোকানে ওসব কিনতে পাওয়া যায়, সিনেমার অনেক খবর নাকি থাকে ওতে। বনোয়ারী ছেলেদের এইভাবে ব্যস্ত থাকতে দেখে চাইল। বেশ রেগে উঠেছে সে।

বনোয়ারী বেশ চড়া গলায় বলে—তোরা রইলি ঘরে বসে, আর ওই বোনটাকে এই ধুপরোদে মাঠে মাঠে ঘুরতে পাঠালি জন মজুরের মুড়ি দিতে? তার কথা এতটুকুও ভাববি না?

বড় বৌ বাসিনীও এসে পড়েছে। শ্বশুরের কথা শুনে একটু গলা চড়িয়েই জানায় বাসিনী—ওই তো নিজে গেল। মেয়ের যে বার-মুখো টান তা কে না জানে? ঘরে কি মন থাকে? নিজেই মুড়ির টিন নিয়ে ছল করে বেরুলো মেয়ে।

বনোয়ারী চমকে ওঠে—কি বলছো এসব কথা?

ওদের কথাবার্তা শুনে ব্যাপারটা ঘোরালো হতে দেখে ছোট বৌও এসে জুটেছে। ওরা জানে ওই তরঙ্গ আর বুড়োটাই তাদের পথের বাধা। বুড়োর দিন শেষ হয় না। আর তরঙ্গই যেন ওকে মাঠে পাঠানোর ব্যাপারে বাবাকে সাতখান করে লাগিয়েছে। তাই কালী ও মদনের দোষ এড়াবার জন্যে ছোটবৌ শোনায়—ফিরে এলে ঠাকুরঝিকে কথাটা শোধাবেন আপনি। ঠাকুরঝিই নিজে থেকে গেল। আমি তো মানা করলাম কতো।

বনোয়ারী কি ভাবছে।

কিশোরী এতক্ষণ কি জবাব দেওয়া যায় তাই ভাবছিল। সহরে যেতে হবে তাকে বাসিনীকে নিয়ে, এখানে তাব যেন মন টেকে না। ভোর থেকে উঠে দুধ দোহানো—দুধের হিসাব রাখা ছাড়াও লোক জনদের মাল বুঝিয়ে দিতে হয়। আর সব চেয়ে খারাপ লাগে টাকার লেনদেনটা এখানে হয় না, সহরের গদিতে হয়, বনোয়ারীই নিজে সেটা দেখে ভাল করে। এখানে দুধ বিক্রীর টাকা আনে ওই তরঙ্গ। বাবা আর মেয়েই সব দেখাশোনা করে।

তারা যেন কেউ নয়।

এ নিয়ে বাসিনীও বলেছে কিশোরীকে—তোমরা কোথাকার কে ? মেয়েই তো সব। শুনছি ওনাকেই নাকি সব দেঁবে থোবে।

সবদিক থেকেই ওরা তরঙ্গকে সইতে পারে না। আজ বাসিনীর কথায় কিশোরী যেন নোতুন একটা কিছুর সন্ধান পায়।

এসব খবর ছেলেদের ঠিক জানা নেই। কিন্তু কোন অদৃশ্য পথে, গোপন কানাকানিতে মেয়েদের কানে খবরটা ঠিক পৌছে গেছে। কিন্তু বাসিনী সাবধানী মেয়ে, তাই বনোয়ারীর সামনে বেশী কিছু প্রকাশ করে না। একটু ছুঁইয়ে দিয়ে দেখছে বনোয়ারীর কঠিন মুখে ভাবনার রেখাগুলো কেমন ফুটে উঠেছে।

বনোয়ারী চুপ করে সরে গেল। রোদে তেতে পুড়ে গা-মাথা

কেমন ঝিম-ঝিম করছে তার। এসময় এসব কথা শুনতে ভালো লাগেনা। তাছাড়া আঘাতও পেয়েছে সে ওই কথায়।

বাবা সরে যেতে কিশোরী স্ত্রীর দিকে চাইল। চাপা কৌতুহলী স্বরে শুধোয়—কি গো ? কি ব্যাপার ? জোঁকের মুখে চুন দিলে দেখছি।

মদন আর ছোটবৌ চলে গেছে বাড়ির ভিতর। কিশোরীর প্রশ্নে বাসিনী ওর চোখের তারায় মিষ্টি ঝিলিক তুলে এদিক-ওদিক চেয়ে বলে ওঠে—তোমার বোনের মনে যে রং ধরেছে গো ? এতবড় খবরটা জানো না ?

—তাই নাকি ! চমকে ওঠে কিশোরী !

ওর মুখখানা কঠিন হয়ে ওঠে। হঠাৎ যেন তাদের আত্মসম্মানের কঠিন দুর্গে চরম আঘাত করেছে ওই তরঙ্গ। কিশোরী চাপাস্বরে শুধোয়—ছেলেটা কে ?

বাসিনী জবাব দিল না। ওর ঠোঁটে ধারালো হাসির ঝিলিক ফুটে ওঠে মাত্র। স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে কিশোরীর দিকে। বাসিনী দেখছে ওই লোকটার মনে সে একটা ঝড় তুলেছে।

প্রথমে গজাননকে ঠিক চিনতে পারেনি বকুল। ভেবেছিল বোধহয় প্রমথবাবুরই কোন আত্মীয় হবে। তাই একটু সমীহ করেই কথা বলতো। আর দেখেছে মানুষটা সবটাতেই আছে। ক'দিনে দেখেছিল বকুল তার স্বামী নামক মানুষটা একটু বোকা-সোকা ধরনের, ওর হাল ধরে আছে গজাননই। এখানে ফেরার সময় দেখেছে গজাননকে—পথের কষ্টও সে বকুলকে টের পেতে দেয় নি। খাবার চা কলা এটা সেটা ঠিক জুগিয়েছে। রাতে জংশন ষ্টেশনে খাওয়াবার জন্য গজাননই ওকে নিয়ে যায় রেলওয়ে ক্যাটারিং-এ।

এখানে নোতুন বাসায় এসে বকুল দেখেছে গজাননের অন্তরূপ। সকালের ট্রেণে এখানে নেমেছে বকুল।

ক'দিন দেহমনের উপর দিয়ে একটা ঝড় বয়ে গেছে। বহরমপুরে

যে কঠিন মন নিয়ে যুঝবার চেষ্টা করেছিল বকুল সেই মনটা আজ ক্লান্ত। কেমন একটা স্তব্ধতা নেমেছে। বকুলের মনে হয় নোতুন এই পরিবেশ—এই ঘটনাগুলো তার কাছে অনেক বৈচিত্র্য এনেছে, আর আপাততঃ বকুলকে মেনে নিতে হয়েছে এই পরাজয়কে।

বাসাটা ছোট্ট; দুখানা ঘর ভিতরের দিকে জাফরি ঘেরা একটু বারান্দা, রান্নাঘর—সামনে একফালি উঠোন, ওদিকে বাথরুম পায়খানা। রেল কোম্পানীর হিসাবমত এর পরিসর, ছক বাঁধা এর পরিসীমা। তবু ওদের দুজনের পক্ষে যথেষ্টই।

বাইরে একটা বকুল গাছ ঝাঁকড়া ডালপালা মেলে দাঁড়িয়ে আছে। আম বটগাছেরও অভাব নেই। আর রয়েছে জামগাছের জটলা, নিম গাছে ফুল ফুটেছে—বাতাসে মিষ্টি গন্ধ ওঠে। পাখীগুলো কলরব করে।

বকুল জানতো না যে নিমফুলেরও মিষ্টি গন্ধ আছে। হাড়তেতো ওর পাতা, গাছের ছাল। তবু ওর ফুল সুগন্ধময়—উদাস করে তোলে মন। এই নির্জন জগত তাকে আনমনা করেছে।

গজানন বলে—জল তোলা আছে বৌদি। চান সেরে নিন। চা হয়ে গেছে। সকাল সকাল রান্না সেরে নিচ্ছি, খেয়ে দেয়ে জিরোন। যা ধকল গেছে ক'দিন।

বকুল হাসল একটু। গজানন উনুনে কয়লা দিয়ে এর মধ্যে মাছ যোগাড় করেছে, ওটা অবশ্যি রূপসীই ট্রেনের মাছের পাইকেরদের কাছ থেকে নিয়ে রেখেছে, তরিতরকারীও আছে। তরঙ্গ এর মধ্যে দুধ দই আর ছানা কিছু দিয়ে গেছে বউদির জন্য।

. রূপসী মাছ কুটতে কুটতে ওই ধকলের কথা শুনে বলে।

—তা যা বলেছো বাঠাউর। বলেনা, সাত পাক দেখলে সাত রাত চোখের ঘুম যায় না গো। আমার বিয়ের সময়—

গজানন ধমকে ওঠে—তোদের আবার বিয়ে? খড় জেলে তিনবার পাক মারলেই সাঙ্গা হয়ে গেল। বিয়ের কি বুঝবি তুই?

রূপসী ফুঁসিয়ে ওঠে—সাঙ্গা কি র‍্যা! মুখে নুড়ো জ্বেলে দেব বামনার! আমি কিনা বাটুর বাপের সাঙ্গাকরা বউ! এতবড় কথা!

বকুল হাসতে থাকে—কি হল?

রূপসী গজরায়—ওই মুখপোড়ার কথা শুনো না বৌদি।

—নাও বৌদি! চা নে রূপসী। থাম দিকি।

গজানন এর মধ্যে চায়ের কাপটা এনে নামিয়ে দেয় বকুলের সামনে। সেই সঙ্গে এক কাপ দিয়েছে রূপসীকেও। রূপসী চা পেয়ে তখনই বিয়ে আর সাঙ্গার পার্থক্যটা ভুলে গিয়ে চুমুক দিতে থাকে।

•

গানের সুর ওঠে—মনে হল যেন পেরিয়ে এলাম অন্তবিহীন পথ। সন্ধ্যার আঁধার এখানে আলোয় ভরে গেছে, সুরে ভরে গেছে চারিদিক। কোন অনুষ্ঠানে গাইছে বকুল। খোঁপায় রজনীগন্ধার মালা। যুঁই-এর বৃষ্টিভেজা সুরভি কি আবেশ আনে। তন্ময় হয়ে গাইছে বকুল। সামনে পেছনে চেনা অচেনা মুখের সারি, ও জানে—তার গানের সুরের ব্যাকুল আবেগ ওদের মনকে স্পর্শ করেছে, নিয়ে গেছে কোন অন্য জগতে।

বেহালার সুরটায় বকুলের গলার সুরপঞ্চম যেন মিলে গেছে।

হঠাৎ কার বিশ্রী কর্কশ আওয়াজে চমকে ওঠে বকুল। চমকে উঠে চোখ মেলে চাইল হতচকিত চাহনি মেলে। মনে হয় কি যেন স্বপ্ন দেখছিল সে। গান, সেই রজনীগন্ধার সুবাস, বহরমপুরের চেনা-অচেনা মুখের শোভাযাত্রা, তার সুর—সব কি নিষ্ঠুর বেদনায় ব্যর্থ হয়ে গেছে। হারিয়ে গেছে।

বকুল কেমন বিভ্রান্ত চাহনি মেলে দেখছে রূপসীকে, জানলার বাইরে ওই পাহাড়ের সীমা, বনের সবুজ রেখাগুলোকে ঠিক চিনতে পারে না। কোথায় স্বপ্নের ঘোরে হারিয়ে গেছে সে।

ক্রমশঃ মনে পড়ে বকুলের। বহরমপুরের জগৎ থেকে বনবাসে নির্বাসিত হয়ে এখানে এই পলাশপুরে এসেছে। ওই মেয়েটাকে

সকালে দেখেছিল। নোতুন এক জগতে স্বতন্ত্র পরিবেশে এসে পড়েছে বকুল।

এতক্ষণ পর ওর দৃষ্টিটা যেন ঠিক কেন্দ্রীভূত হয়ে ওঠে। ভাবনা-গুলোর খেই খুঁজে পায়, আবার ফিরে আসে এই জগতের নিঃস্বতার মাঝে।

বকুল ঘুমিয়ে পড়েছিল খাওয়া-দাওয়ার পর। গভীর ঘুমে ডুবে গেছল। রূপসীর ডাকে উঠেছে। দেখে বিছানাটা ওপাশে শূন্য, প্রমথ নেই। কখন উঠে চলে গেছে। রূপসী বকুলকে উঠতে দেখে বলে।

—কতো ডাকছি বৌদি। তা ঘুমোবেই তো! মানে রাতে তো ঘুম হবেনি গো।

বকুল ওর দিকে চাইল। এই জায়গাটা ফাঁকা—ধূ ধূ মাঠ বন আর পলাশ বন। রাতে ঘুমিয়ে পড়া যেন নিরাপদ নয়। কে কোন দিক থেকে এসে গলা টিপে শেষ করে রেখে যাবে। তাই বকুল শুধোয়। —রাতে ঘুমোতে পারা যাবে না কেন? চোর-ডাকাত আসে নাকি? চারিদিক তো ফাঁকা।

রূপসীর কালো মুখে সাদা দাঁতগুলো বের হয়ে পড়ে। রূপসী বলে ওঠে—নাগো। লোতুন লোতুন বিয়ে কিনা, রেতে কথাবাত্তা কইতে কইতে কখন বিয়েন বেলা হয়ে যাবেক, বুঝতেই লারবা বৌদি। আমাদের মানুষটা, ওই বাটুর বাপ গো, রাতভোর গায়েন শোনাতো। কতো গায়েন।

হেসে ফেলে বকুল। প্রসঙ্গ এড়াবার জন্যেই বলে,—চা করতে পারবে? গজাননদাকে দেখছি না তো।

রূপসী বলে—চা আমিই করছি। সে বামনাকে আর পাবে? ত্যানার তো এবার ডানা গজাইবেক গ! গদিয়ান হয়ে বসেছে বোধ হয় এতক্ষণ।

বৈকালে গজাননকে আর দেখেনি বকুল।

প্রমথ এর মধ্যে একবার এসেছিল কোয়ার্টারে। বকুল চা-এর কাপটা এগিয়ে দেয়। প্রমথ এর মধ্যেই সেই ধুতি পাঞ্জাবী ছেড়ে খাঁকি প্যান্ট আর সাদা কোট শ্রীঅঙ্গে চাপিয়ে ফেলেছে।

বকুল দেখছে লোকটাকে। কোট ছাপিয়ে ভুঁড়ির কিছুটা ঠেলে উঠেছে। প্রমথ এখানে একটা স্বতন্ত্র মানুষ। বোকা বোকা ভাবটা এখানে অনুপস্থিত, তাতে কিছুটা ব্যক্তিত্ব ফুটে উঠেছে। প্রমথ মোড়াটা টেনে চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে বলে।

—আজই ফোরনূনে জয়েন করে গেলাম, এসেই যখন পড়েছি—একটা দিন ছুটি মারা যায় কেঁন? হেডকোয়ার্টারে ম্যাসেজ দিয়ে দিলাম। তা কেমন লাগছে জায়গাটা? বেশ নিরিবিলি, কি বলো?

বকুল উত্তর দেবার আগেই জবাবটা প্রমথই দিয়ে বলে—একটু বেড়াতে বেরিও বৈকালে। রূপসীই রাতে রুটি-ফুটি করে দেবে তুজনের। আগুনের তাতে থাকা অব্যেস নেই, ওসব নাই বা করলে এখন থেকে।

বকুল বলে—ওখানেও রান্না করতে হতো। ওসব অভ্যাস আছে।

প্রমথ জবাব দিল না। কোটের পকেটে কারে বাঁধা গোলমত একটা ঘড়ি বের করে ওটার দিকে চেয়ে বলে—বসে যে গল্প করবো তার সময় আছে? থ্রি থার্টিনাইন ডাউনের সময় হয়ে এল। যাই, ট্রেনটা পাশ করাতে হবে। বুকিংও আছে।

ওদের জীবন ওই লাইনের গাড়ির ছকে বাঁধা। আলাপের সময়ও সীমিত। ওদের জীবনটা রেল গাড়ির গতিপথের মতই পয়েন্ট, সিগন্যাল এর বাধায় আষ্টেপিষ্টে জড়ানো। একটা খালি মালগাড়ি চলেছে কোলিয়ারীর দিকে। লাইনে শূন্য মাল গাড়ির কর্কশ শব্দ ওঠে।

নির্জন ঘর খানায় ভালো লাগে না বকুলের। তাই বৈকালে স্নান সেরে বের হয়েছে বকুল বাইরের দিকে। উঁচু চড়াই-এর উপর থেকে

দেখা যায় নীচের সমতল করা জমির উপর ষ্টেশনের ঘর, প্লাটফর্মের গাছ-গাছালি, ওভার ব্রীজও রয়েছে। পড়ন্ত বেলায় বকুল ওই নোতুন সীমান্তের দিকে চেয়ে থাকে, পাহাড়ের কালো ছায়া পড়েছে ছোট্ট নদীর জলে, পাহাড়ের ঘন বন সবুজের মাথায় দেখা যায় শেষ আলোয় সাদা একটা বিন্দু।

প্লাটফর্মে যাত্রী তেমন কেউ নেই, বৈকালের ট্রেণে এখানের যাত্রীদল বেসাতি সেরে ফিরেছে। ওরা খালি টিন ঝুড়ি বাঁক নিয়ে যে যার গ্রামের দিকে চলে গেছে। প্লাটফর্মের একটা লাইনে কালো সর্বাঙ্গে ভুষো কালিমাখা জীর্ণ একটা ইঞ্জিনের সঙ্গে কটা কয়লা বোঝাই মালগাড়ি লটকানো, ইঞ্জিনটা ধুঁকছে আর ধোঁয়া বের হচ্ছে চিমনি থেকে।

বকুল ওদিকের কয়েকটা চালাঘরের দিকে এগিয়ে যায় আম গাছের নীচে। দু চারজন মানুষও রয়েছে সেখানে। দোকানের বাইরে দু একটা নড়বড়ে বেঞ্চে তেল কালি মাখা পোষাক পরে ওই ইঞ্জিনের ড্রাইভার ফায়ারম্যান চা খাচ্ছে। বকুলকে দেখে গজাননই বের হয়ে আসে। খুশী হয় গজানন,

—বেড়াতে বেরিয়েছো বৌদি? এখানে আর কোথায় বা বেড়াবে?

বকুল দেখছে ওকে। লোকটা সকালের রান্না সেরে গায়েব হয়ে গেছল, একে এখানে দেখে বকুল বলে—সারাদিন দেখা নেই আপনার?

গজানন জানায়—দোকানে ক'দিন ছিলাম না, তাই ফিরে এসে আর অবসর পাইনি। কইরে পদা, ভালো করে গরম জলে গ্লাস ধুয়ে চা দে। বসো, বাইরেই বসো, ভিতরে তো ভাপসা গরম। একটু চা খাও বৌদি।

ওই ড্রাইভার, ফায়ারম্যানও দেখছে বকুলকে। এমন শাড়ি পরা সভ্য জগতের মেয়ে এখানে আসে না। নিজেদের মধ্যে কি বলাবলি করে ওরা। গজানন ওদিকে কাজে ব্যস্ত। ড্রাইভার পয়সা মিটিয়ে চালু

উৎরাই বয়ে পরিত্যক্ত ইঞ্জিনটার দিকে এগিয়ে গেল বৈকালের চা-পর্ব সেরে, সিটি বাজিয়ে সাইডিং থেকে কয়লার রেক ক'খানাকে টেনে সামনের জংশন ষ্টেশনের দিকে চলে গেল ইঞ্জিনটা। লাইন ক্লিয়ার দেওয়াই ছিল ওদের।

এতক্ষণ তবু কিছু সাড়া—দু চারজন লোকও ছিল। ওরা চলে যেতে জায়গাটায় স্তব্ধতা নামে। আমগাছগুলো বনস্পতির মত শাখা-প্রশাখা মেলে অনেকখানি ঠাঁই দখল করে আছে। আলোয় ছায়ায় দোকানের ঠাঁইটুকু ভরানো। আর হাজারো পাখীর কলরব ওঠে দিন শেষের আকাশে। নানা পাখীর মেলা বসেছে।

বকুলের মনে হয়, এই স্তব্ধতা—ওই পাখীর ডাক—বাতাসের সুর সব কিছুর মাঝে তার অনুভূতিটুকু কোথায় অতি সামান্য বলেই বোধ হয়। বিরাট সীমাহীন বিস্তৃতির মাঝে সে অতি তুচ্ছ। ওর মনের অতলে নিজের এই পরিবর্তনটা চোখে পড়ে।

গজানন বলে—জায়গাটা কেমন লাগছে বৌদি? আমার তো ভালোই লাগে গ। ক'বছর আগে বানে ভাসা খড় কুটোর মত এসে-ছিলাম। ওই বাবুই ঠাঁই দিলেক। আর জায়গাটার মায়ায় শিকড় গেড়ে বসে গেলাম। চা খাবারের দোকানটা থেকেই এখন চলে যায়। একটা পেট—তার জন্যে আর কতো দিক্‌দারী করবো? তাই এখানেই রয়ে গেলাম।

বকুল দেখছে লোকটাকে। নিজের প্রয়োজনকে সে সীমিত করে রেখেছে। আর মনের কোন জ্বালা বোধ হয় ওর মনের প্রশান্তিকে স্পর্শ করতে পারে নি। তাই কোন জ্বালা ওর নেই। শান্তিতে আছে।

বকুলের মনের নিঃসঙ্গ শূন্যতা, তার মনের হাহাকারগুলো যেন এখানে কোথায় হারিয়ে গেছে। বকুলও সব ভুলে সামান্য নিয়ে খুশী থাকতে চায়।

আকাশে আলোর রং বদলায়, শান্ত বন প্রান্তরে বৈকালের আলো রঙীন হয়ে উঠেছে।

গজানন ওকে উঠতে দেখে বলে—যাবে কোনদিকে? ওই পথ ধরে যেতে পারো কদম দ' নদীর ধারে। নোতুন জায়গা, বেলা পড়ার আগেই ফিরবে কিন্তু। পদাকে সঙ্গে দোব?

দোকানের বাচ্চা চাকরটা গেলাস ধুচ্ছিল, গজানন বেসম মাখছে। সন্ধ্যার ট্রেণে কিছু লোকজন নামে, আর বিষনপুরের গাঁয়ের বাইরেই নোতুন শুঁড়িখানা বসেছে। সেখান থেকেও অনেকে গরম তেলেভাজা কিনতে আসে। সন্ধ্যার ঝাঁকে কিছু বিক্রী বাটা হয়। তারপর সেই উনুনেই গজানন ভাতে ভাত চাপিয়ে দেয় ওর জন্যে।

বকুল ছেলেটার কথা উঠতে জানায়—না, না। ওইতো ব্রীজ দেখা যাচ্ছে, ওখান থেকেই ফিরবো।

একা একাই বের হয়ে যায় সে লাইনের ধারের পায়ে চলা পথ দিয়ে। বৈকালের আলো মুছে মুছে আসছে। পাহাড়গুলো নির্ধুম রোদপড়া বেলায় স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সাদা বিন্দুটাকে দেখে মনে হয় একটা মন্দিরই হবে বোধ হয়। ওই পাহাড়ের উপর কে মন্দির বানাতে গেল কে জানে? পড়ন্ত রোদে ওটা যেন চিক চিক করছে। টেলিগ্রাফের তারে হাওয়া লেগে শন শন শব্দ ওঠে।

খাড়া লাইন থেকে বকুল সাবধানে নামছে সামনের ছোট্ট নদীর দিকে। লোকজন কেউ কোথাও নেই। চলার সুবিধের জন্য শাড়িটা সায়া সমেত খানিকটা তুলেছে, পায়ের মসৃণ মাংসল পেশীগুলো বের হয়ে পড়ে। ওর নরম সুগঠিত হাত দিয়ে নিজের শরীরের ওই ছন্দটাকে অনুভব করে লজ্জা পায় বকুল। এ যেন বিচিত্র একটা রোমাঞ্চকর অনুভূতি। কেউ কোথাও নেই। না, দেখতেও আসবে না কেউ তাকে এখানে। তার নিজের যৌবনের ঢলনামা দেহটাকে আজ নিজেই যেন মুগ্ধ দৃষ্টিতে দেখছে।

বকুল বেআব্রু বোধ করে নিজেকে, কিন্তু ভাল লাগে। বেশ ঝুঁকে পড়ে নামছে ঢালু রেল লাইন থেকে নদীর দিকে। ব্রাউজের

মুক্তির অবকাশে উদ্ধত বুকটা কাঁপছে, শাড়িটা সরে গেছে দমকা বাতাসে, বকুল যেন নিজের একটা নোতুন সত্তাকে প্রকৃতির এই নির্জনতার মাঝে খুঁজে পেয়েছে।

ছোট নদীটায় হাঁটু ভোর জল বয়ে চলেছে, নীচের দিকে বেশ খানিকটা গভীর দহের মতই। জলটা সেখানে কালো, কয়েকটা পাথর এদিক ওদিকে জেগে আছে। খানিকটা জল পার হয়ে বকুল একটা পাথরে বসে পাটা জলে ডুবিয়ে দেয়, ঠাণ্ডা একটা অনুভূতি জাগে। শিহরণ লাগে।

হঠাৎ কিসের শব্দে চাইল ওদিকে। একটু অবাক হয়।

কয়েকটি মেয়ে একটা ঝাঁকড়া মহুয়া গাছের নীচে নদীর জলে স্নান করছিল। ওদের কাপড় চোপড় গুলো ডাঙ্গায় নামানো, বুক জলে দাঁড়িয়ে ওরা দেখছে বকুলের দিকে চেয়ে, বকুল কি লজ্জায় পাটা তুলে হাঁটুর নীচে শাড়িটা নামিয়ে দেয়, হাসছে মেয়েগুলো। ওদের ছোট্ট কাপড়টুকু ওদের অফুরান যৌবনময়ী দেহের অনেকটুকুকেই অনাবৃত রেখেছে। কিন্তু বকুলের মত অকারণ লজ্জা ওদের নেই।

স্নান সেরে কাপড় বদলে মেয়েগুলো হাসতে হাসতে চলে গেল। বকুলের মনে হয় ওরা বোধ হয় এখানেই স্নান সেরে যায় কাজের শেষে। ওরও ইচ্ছে করে অমনি অবগাহন স্নান করতে। কিন্তু। লজ্জা করে, ওদের মত মুক্ত হতে পারে না।

বেলা পড়ে আসছে। নদীর ওদিকে কয়েকটা অজানা গাছে লতায় এসেছে সাদা ফুলের গুচ্ছ।

বকুল এগিয়ে চলেছে। হঠাৎ ওই গাছ গাছালির আড়ালে কাদের কথার শব্দ শুনে থমকে দাঁড়ালো, ফেরার পথ নেই। ওরা দেখতে পাবে। বকুলেরও ভয় হয়, কে জানে নির্জনে যদি একা পেয়ে তাকে আক্রমণই করে বসে। তবু মনে হয় স্নান সেরে ওই মেয়েগুলো বেশী দূর যায় নি—চিৎকার করবে কিনা ওদের উদ্দেশ্যে। ভয়ে ভয়ে গাছের ওদিকে চাইল সে।

দৃশ্যটা দেখে চুপ ক'রে গেছে বকুল। অবাক হয়ে চেয়ে থাকে ঝোপের এদিক থেকে ওপাশের দুজনের দিকে। একটি মেয়ে আর ছেলেকে দেখেছে। মেয়েটিকে চিনতে পারে।

তরঙ্গ!

ওই মেয়েটাই তাদের ওখানে দুধ দিতে যায়। ওর সঙ্গের ছেলেটিকে চেনে না। তবু বকুল ওদের দুজনের চোখের ভাষা বুঝতে পেরেছে। ভালোবাসার সেই ভাষা সে বুঝতে পারে। বকুল নির্বাক চাহনি মেলে ওদেব দুজনকে দেখছে।

ভজন বৈকালের ট্রেণে ফিরে এসে বনোয়ারীর বাড়িতে গিয়ে মালপত্রের হিসাবগুলো চুকিয়ে দেয়, দুধ যোগানদার ছানা বইয়েদের মূল প্রতিনিধি সে। সহরের খুঁটিতে কি হিসাব হল, দর উঠলো, সে খবর মায় লেনদেনের কিছু টাকাও আনতে হয় তাকে। বনোয়ারী ছেলেটাকে বিশ্বাস করে, নিজের ছেলেদের উপর ভরসা তার নেই।

কিশোরী মদন খাতায় তোলে সেই হিসাব। টাকাও জমা করে বনোয়ারীর সামনে। আর আড়ালে বলে—ব্যাটা ভজাই যেন সব।

হিসেব বুঝিয়ে দিয়ে ভজনের তারপর ছুটি। সারা দিনের পরিশ্রমের পর এই সময়টুকু তার অবকাশ মেলে। সন্ধ্যার পর গোয়ালের গরু মোষের তদারক করতে হয়। মদন তখন মদের বোতল খুলে বসে, আর কিশোরী বের হয়ে পড়ে কোন আদিবাসী পাড়ায় মহুয়া আর তাজা মহামাংসের সন্ধানে। দুজনেই ওইসব ব্যাপারে ডুবে থাকে।

বনোয়ারী নিজেই ভজনকে নিয়ে কাজকম্মো দেখে আর গজরায়—শালা বিজাতগুলোনকে এবার খেদিয়ে দোব। বুকে বসে দাড়ি ওপড়ানোর পাট চুকিয়ে দোব ওদের। মোষগুলোকে জাব দিয়েছে রে ভজন? একটু ছাখ বাবা।

তারও তদারক করতে হয় ভজনকে। ভজনের চোখে এ বাড়ির

বিচিত্র মানুষগুলোর রূপ পরিষ্কার হয়ে ধরা পড়েছে। ভজনও জানে এখানে তরঙ্গ কি অবস্থায় রয়েছে। তারও মনে হয় বনোয়ারীর এই অসহায় নীরবতাই তরঙ্গের জীবনে এমনি পুঞ্জীভূত অবিচার এনেছে। তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করারও সাহস যেন মেয়েটার নেই।

ভজন নিজেও দু একটা গরু মোয় করেছে। তার দুধও ওইখানেই বিক্রী করে। মনে হয় নিজেই এবার কারবার সুরু করবে সে, সহরের মহাজনদের কাছে আগামও কিছু পেতে পারে, কিন্তু ওই বনোয়ারী আর তরঙ্গের জন্যই এখান থেকে বের হয়ে যেতে পারে নি। কি মায়ায় আটকে আছে ?

তবু বৈকালের দিকে ভজন এই দিকে আসে। এ সময় কদমদহের দিকে কেউ থাকে না। নির্জন বনভূমিতে স্তব্ধতা নামে। বাঁশের বাঁশীটা সঙ্গে নেয়। ভজনের ওই একটা সখ, গান গাইতো গাঁয়ের কেষ্ট যাত্রার দলে, এখনও মাঝে মাঝে গায়, বাঁশী বাজায়।

আজ ভজন দেখেছে বনোয়ারীর চোখে-মুখে একটা থমথমে নীরবতা। অন্যদিন বনোয়ারী তার কাছে সহর গঞ্জের নানা খবর নেয়। দর-দাম মাল আমদানীর কথাও শুধোয়।

আজ বনোয়ারী গুম হয়ে থাকে। বনোয়ারীর মনে তখনও কথাটা ঘুরছে, তরঙ্গের সম্বন্ধে কিশোরীর বউ যে মন্তব্যটা করেছিল সেটা ভুলতে পারেনি বনোয়ারী। মনে মনে ভয়ও হয়। তরঙ্গের কিই বা বয়েস। তখন স্ত্রীর কথায় তরঙ্গের বিয়ে দিয়েছিল খুব অল্প বয়সে, কিন্তু মেয়েটার বরাত মন্দ। জামাই মারা গেল হঠাৎ, তরঙ্গ তখন অনেক ছোট।

তারপর ক্রমশঃ তরঙ্গের দেহে এসেছে যৌবনের ঢল। ওর রূপ যেন উছলে উঠেছে। তবু বনোয়ারী বিশ্বাস করে তরঙ্গ তেমন মেয়েই নয়। এসব নোংরা কাজ সে করতে পারবেনা। কিশোরীর বৌ তাকে মিছে কথা বলেছে।

কিন্তু ভয়টা মুছে যায়নি বনোয়ারীর মন থেকে। মেয়েটাকেও কিছু জিজ্ঞাসা করতে পারে নি সে। এসব কথা নিয়ে আলোচনাও

করা যায় না। বুড়ো তাই চুপ করে থাকে। মনের অতলে ভাবনায় কালো মেঘ নামে তার।

বৈকালে ভজন ফিরে এসে হিসাব পত্র নগদ টাকা মিটিয়ে দেয়। বনোয়ারী গুম হয়ে বসে ছিল ওদিকে। হুঁকোটা টানার ইচ্ছেও তার নেই। কলকের আগুন নিভে এসেছে। বনোয়ারী কিশোরীর দিকে দেখিয়ে ভজনকে বলে।

—হিসেব পত্র কিশোরীকে বুঝিয়ে দিয়ে যা। ক্যাস-কড়িও দিবি ওকেই।

কিশোরী একটু খুশী হয় মনে মনে। আজ তার বৌ বাসিনী বুড়োর মনে একটা জব্বর ঘা মেরেছে। তাতেই বনোয়ারীর সংসারের কাজে এসেছে নিরাসক্ত ভাব। এই ব্যাপারটাকে আরও একটু ঘোরালো করে তুলতে পারলে তাদেরই লাভ হবে। কিশোরীই ভজনের কাছ থেকে টাকাকড়ি নেয়। ভজনও চুরী করে সেও দেখাতে চায়।

ভজন একটু অবাক হয়েছে। কিশোরী তবু জেরা করে—ছানার দর কম হল কেন আজ ?

কিশোরী কর্তৃত্ব ফলাতে চায় আজ থেকেই।

ভজন বলে—খুঁটিতে আমদানী আজ বেশী ছিল। তাই দর ওঠেনি।

কিশোরী বোদা মুখ করে বলে—আর বাকীর টাকাগুলোর তাগিদ দিবি পাইকারদের কাছে।

কিশোরী যে তার মালিক এই কথাটাই যেন জানাতে চায়। ভজন বনোয়ারীর দিকে চাইল। বুড়ো কি ভাবনায় হারিয়ে গেছে। ভজনের কাছে আজ এবাড়ির জীবনযাত্রার মাঝে একটা যে পরিবর্তন ফুটে উঠেছে সেটা ধরা পড়ে। বনোয়ারীর দিকে চাইল ভজন। বুড়ো যেন আজ সব কাজের হাল ছেড়ে দিয়েছে।

ভজন ও বাড়ি থেকে বের হয়ে আসে। তার কাছেও এটা কেমন বিচিত্র বোধহয়। কারণটাও তার অজানা।

বৈকালের আলোটুকু আকাশ থেকে মুছে মুছে যাচ্ছে। পাহাড় সীমা ছায়া অন্ধকারে হারিয়ে যায়। তরঙ্গ জানে ভজন এ সময় থাকবে কদমদহের পলাশবনে, তাই মেয়েটাও এসেছে। ওদের দুজনের মনে একটা প্রশ্ন জাগে।

ভজন বলে—কত্তামশায়কে দেখলাম গুম হয়ে আছে। কিশোরীদাকে হিসাব পত্তর বুঝিয়ে দিতে বল্লে।

তরঙ্গও দেখেছে বাবাকে। একদিনের কি আঘাতে মানুষটা যেন বদলে গেছে। দেখেছে দাদা-বৌদি, ছোটদার মুখে হাসি-খুশী ভাব। ওরা নিজেদের মধ্যে আজ বেশ হেসে চুপি চুপি কি কথা কইছে। তরঙ্গের মনে হয় কিছু একটা ঘটেছে। কিন্তু সঠিক কারণটা সেও জানে না। তাই তরঙ্গ জানায়—তাই দেখছি। কি যেন হয়েছে।

ভজন বলে—ওই কিশোরীদার সর্দারী সইবো না, ভাবছি ওসব ছেড়ে এবার নিজেই কাজ কারবার সুরু করবো বিষণপুরে।

—ভজন। তরঙ্গ কি অজানা আতঙ্কে চমকে ওঠে। ভজন ওখানে রয়েছে তাই তরঙ্গের সঙ্গে রোজ দেখা হয়। তরঙ্গের সারা জীবনটা কি যন্ত্রণায় বিবর্ণ। তার মাঝে ওই ভজনই এনেছে একটু আশার আলো। সেটুকু হারাতে চায় না সে। তরঙ্গের দুচোখে নীরব বেদনার আভাষ জাগে। ভজন সেটা দেখে ওকে কাছে টেনে নিয়ে বলে,

—ওখান থেকে চলে গেলে তোকেও সঙ্গে করে নিয়ে যাবো তরঙ্গ। ও বাড়িতে তোকে রেখে যাবো না।

ভজনের সেই সাহস আছে। বলিষ্ঠ একটি তরুণ, আর কোন বাঁধন তার নেই, তাই বেপরোয়া গোছের। তরঙ্গের কিন্তু অনেক বাঁধন। বাবার কথা মনে পড়ে, তার ঘর সমাজ আছে। ওর কিছু পাবার অধিকার নেই। তবু মন মানে না, এমনি করে সামান্যতম পাওয়ার স্বপ্ন নিয়ে সে অন্ধকারেই থাকতে চায়। ভয়ে শিউরে ওঠে তরঙ্গের ভীরু মন।

—তা কি করে হয়। আমি চলে আসব ঘর ছেড়ে?

—কেন? ভরসা হয় না বুঝি। ভজন বলে ওঠে।

হাসছে দামাল ছেলেটা। ও দু'হাত দিয়ে তরঙ্গের নিটোল মুখখানা তুলে ধরে। ভজন সহরে যায়, দেখেছে সেখানের জীবনকে। শুনেছে এখানের এই নির্জন বন্য প্রান্তরেও বিরাট কলকারখানা গড়ে উঠবে। এই শান্ত জীবনের বুকে ঝড় উঠবে। তাই সে বেপরোয়া। বলে ওঠে ভজন,

—ধ্যাৎ। এখন ওইসব কথা আর আছে নাকি! কি অপরাধ করেছিস তুই তরঙ্গ যে সারাটা জীবন সব হারিয়ে কাঙ্গালের মত বেঁচে থাকবি ওই অমানুষ দাদা-বৌদিদের দাসীগিরি করে?

তরঙ্গও এ কথাটা বার বার ভেবেছে, কিন্তু কোন উত্তর পায় নি এই বঞ্চনার।

বন্ধ দরজায় যেন বার বার মাথা ঠুকে রক্তাক্ত করে তুলেছে নিজেকে। কিন্তু প্রতিবাদ করার সাহস তার নেই। তাই সয়ে গেছে। আজ ভজনের বলিষ্ঠ দেহের ছোঁয়ায় তরঙ্গ যেন নিজের মনকে সাহসী করে তুলতে চায়। অনেক কিছু পেতে চায় সে।

বকুল চুপে চুপে সরে এল। এখানের এই নিভৃত জগতের কি গোপন বেদনাকেও অনুভব করছে সে, তরঙ্গ আর ওই ছেলেটিকে দেখে। ওদের সব কথা শুনতে পায় নি। কিন্তু চোখের ভাষা আর অন্তরের ব্যাকুলতাটুকু দেখেছে বকুল। তাতে আসল খবরটা জানার অসুবিধা হয় নি।

বকুল চুপে চুপে নদীর বালিয়াড়ি পার হয়ে গাছ-গাছালির ঝোপের আড়াল দিয়ে রেল লাইনে এসে উঠলো। এতক্ষণে খেয়াল হয় অনেক দেরী হয়ে গেছে। সন্ধ্যার আঁধার নেমেছে চারিদিকে।

প্লাটফর্মের বাতিদানে কয়েকটা টিবরি বাতি জ্বলছে, তাতে আলোকিত হয়নি জায়গাটা, বরং ওই জমাট আঁধার যেন আরও

ঘনীভূত হয়েছে। সন্ধ্যার শেষ গাড়িটার ঘন্টা হয়ে গেছে। ওটা যাবে কলকাতার দিকে। জংশন ষ্টেশনে বদলি করে বর্দ্ধমানের গাড়ি মিলবে, তারপরও কাটোয়া, সেখানে আর একবার গাড়ি বদল করে তাদের শহরের ষ্টেশনে পৌঁছনো যায়। ঘরের কথা মনে পড়ে—সেই আগত সন্ধ্যায় বিজলী বাতি জ্বলে গঙ্গার বালুচরে। তারা দলবেঁধে বেড়াতে যেতো। গানের সুর ওঠে বালুচরে, তারাগুলো দোল খায়—ঝিকিমিকি করে নদীর কালো জলে।

—বসে আছো এখানে? কার কণ্ঠস্বর শুনে চমকে ওঠে বকুল।

প্রমথ ইষ্টিশান ঘর থেকে বের হয়ে এসেছে, সঙ্গে রামু পয়েন্টস-ম্যান। দিনের ক্যাসকড়ি চামড়ার ব্যাগে সিল করে গার্ড সাহেবকে দিয়ে আজকের মত ছুটি হবে প্রমথের। প্রমথ শুধোয়—একা একা ভালো লাগে না, না?

বকুল ওর দিকে চাইল। প্লাটফর্মে দু'একজন যাত্রীকে দেখা যায়, দূরে বাঁকের মাথায় ট্রেনের হেড লাইটটা উজ্জ্বল বৃত্তের আভাষ নিয়ে এগিয়ে আসছে। গুরু গুরু শব্দ ওঠে ব্রিজের উপর।

শান্ত নীরব এই জায়গার জীবনে ওই ক'খানা গাড়িই যেন প্রাণের সাড়া আনে। আবার তারা চলে যাবার পর পরিত্যক্ত ষ্টেশনটা তার নিজস্ব নির্জন নিঃসঙ্গতার গভীরে ডুবে যায়।

বকুলের কেমন ভালো লাগে না। প্রমথবাবু ষ্টেশনের কাজ সেরে বের হচ্ছে, ছোটবাবু নিখিল এসে পড়েছে। অবশ্য রাতে কোন যাত্রী গাড়ি নেই। নিখিল খাতাপত্রগুলো সারতে বসে লণ্ঠন জ্বালিয়ে, আর রামু রইল ডিউটিতে। মালগাড়িগুলো দূরে কনট্রোল ষ্টেশনের ইঙ্গিতে ছুটে চলবে, তাদের করার কিছুই নেই।

প্রমথবাবু সারাদিন কাজে ব্যস্ত থাকে, সন্ধ্যার পর তাই বকুলকে পেয়ে বলে,

—চলো, একটু ঘুরে আসি।

বকুলের ক্লান্তি এসেছে। বেশ খানিকটা ঘুরেছে সে আগেই। এতখানি চড়াই উৎরাই ভাঙ্গা তার অভ্যাস নেই। তাই বলে,

—রাতের বেলায় বের হবো ?

হাসে প্রমথ। হঠাৎ যেন এতদিন পর তার মনের অতলের একটা কবি মন জেগে উঠেছে। তারাজ্বলা অন্ধকারে এই দিগন্তের নোতুন রূপ দেখেছে সে। তাই বলে ওঠে প্রমথ—কেন ? ভয় টয় কিছু নেই।

বকুল এড়িয়ে যায়—তা নয়। রান্নার ব্যাপার আছে। বাসাতেই যাই। কাল বরং বেরুবো।

প্রমথ একটু ক্ষুণ্ণ হয়। বকুল যেন তাকে এড়িয়ে গেল এইভাবে। সেটাকে চেপে রেখে প্রমথ বলে—তাই চলো।

নস্তুরও সন্ধ্যার পর একটু পানীয়ের দরকার। ইদানীং সেটার স্থবিধে হয়েছে। নস্তু ওপাশের গ্রাম বসতির আম বাগানে ধেনো মদের দোকান থেকে আকণ্ঠ মদ গিলে বেশ মেজাজ নিয়ে গান গাইতে গাইতে ফিরছে। মনটা আজ বেশ ভালোই আছে। নস্তুর ইদানীং আমদানী পত্রও কিছু বেড়েছে। বাসার ওদিকের জায়গাটায় বেশ কিছু মুরগী পুষেছে, আর খাবারের ভাবনা নেই। ডিমও দেয় অনেক তারা। তুধ মহাজন তরকারিওয়ালাদের কাছে থেকে মাঝে মাঝে কিছু বকসিস্ পায়, তাতেই সন্ধ্যার খরচটা উঠে আসে।

নস্তুর মেজাজটাও ইদানীং খুশি খুশি হয়ে থাকে। ডোমরী এসে জুটেছিল এখানে। প্রথমদিন থেকেই মেয়েটাকে দেখে নস্তুর ভালো লাগে। ওদিকের গাঁয়ে তার কোন দূর সম্পর্কের বোন থাকে, ডোমরীর স্বামীটা নাকি বদ, মাতাল। সুদামডির ওদিকে কোন কোলিয়ারীতে কাজ করে। ডোমরীও ওখানেই ছিল।

কিন্তু মাতাল স্বামীটার অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে ডোমরী এখানে চলে এসেছে। নস্তুর সঙ্গে দেখা হবার পর থেকেই নস্তুও কেমন মায়া বোধ করে মেয়েটার জন্তে।

কালো নিটোল দেহ—চোখের চাউনিতে কি কোমলতা ফুটে ওঠে। রূপসীর মত নিষ্ঠুর নয়। তাই বোধহয় নম্বুর ভালো লাগে ওকে।

ডোমরীও বলে—তোমার ভাবনা কি গ', পাকা চাকরী। একটা হিল্লে করে দাও কেন্নে?

নম্বুকে ডোমরীই কথাটা বলে।

নম্বুও চেষ্টায় ছিল। ইষ্টিশান প্লাটফর্ম ঝাঁট দেবার জন্য একজন ঝাড়ুদারনির দরকাব। কিন্তু এখানে ওই কাজ করার মত লোকও মেলেনি।

হঠাৎ নম্বুর কথাটা খেয়াল হয়। প্রমথবাবু তখন ছুটিতে। নোতুন ছোটবাবু নিখিলকে ধরে কয়ে নম্বু ডোমরীকেই কাজটা পাইয়ে দিয়েছে।

ডোমরী খুশী হয়।

আর নম্বুরও দাম বেড়ে গেছে মেয়েটার কাছে। ষ্টেশনে কাজ-কর্ম করার ফাঁকে নম্বুও এক আধটু রসিকতা সুরু করেছে। ডোমরীর অফুরাণ যৌবনমদির দেহের উত্তাল বেবশ ছন্দটা নম্বুর মনে সাড়া এনেছে। মেয়েটা ঝরাপাতাগুলো সাফ্ করতে করতে নম্বুর দিকে চেয়ে শুধোয়—হাঁ-করে দেখছো কি গো?

নম্বুর খেয়াল হয়। হাসছে ডোমরী।

—মেতে উঠেছো লাগছে? তাও তো লাল বারান্ডি প্যাটে পড়ে নি গ?

নম্বুর দিল দরাজ হয়ে ওঠে। বারান্ডি না হোক ধেনো মদ ও খাওয়াতে পারে ডোমরীকে। তাই নম্বু বলে,

—খাবি নাকি রে?

ডোমরী চোখ মট্‌কে জানায়—পেলে খেতাম হে।

ছায়া অন্ধকারময় সন্ধ্যার কথা মনে পড়ে নম্বুর। সেও বলে,

—তাহলে যাবি আজ সাঁঝ বেলায় মদশালে?

ডোমরী হাসছে।

এখন মদশালায় ওদের আসা নিত্যকার ব্যাপার।

ডোমরীর জন্যে তার আসা এখানে। আজ নস্থু আসার সময় গজাননের দোকান থেকে গরম ফুলুরি-কাঁচালঙ্কা দেওয়া ঝালবড়া এনেছিল। ডোমরীকে তাই দিয়ে মদের হুকুম করে বলে ওঠে নস্থুরাম,

—বুকের কল্‌জেখান্ তুকে দিতে পারি ডোমর!

—তাই নাকি গ? মেয়েটি খিলখিলিয়ে হাসছে, ওর নিটোল আদুড় দেহের দিকে চেয়ে থাকে নস্থু মুগ্ধ চাহনি মেলে। ডোমর হাঁক পাড়ে,

—কইগো পানি দাও?

মদওয়ালা হাঁড়িতে করে মদ এনেছে মাপমত। হাঁড়ির গায়ে একটা ছিদ্র করা—আঙ্গুল দিয়ে সেটা আটকানো রয়েছে। মেয়েটা মাটিতে বসে হাঁ করেছে; আর সেই মদওয়ালা আঙ্গুলের ছিপি সরিয়ে নিতে মদের ধারা তোড়ে বের হয়ে পড়ে, অব্যর্থ লক্ষ্য। খদ্দেরের মুখেই পড়তে থাকে মদটা, সেও ঢক্ ঢক্ করে গিলতে থাকে। মদ শেষ হলে, সেও থামে তখন।

মেয়েটার মাতাল কণ্ঠে সুর ওঠে—কালা, তোর তরে কদমতলে।

নস্থু এখন খর্চার হিসাব করে না। রূপসীর তর্জন-গর্জন আর তার নিষ্ঠুর ব্যবহার লোকটাকে যেন তিক্তবিরক্ত করে তুলেছে। সবটাতেই দাবড়ানি তার, আর ওই ডোমর অনেক সুন্দরী। অনেক ভালো। ওর হাসিটা যেন নস্থুকে মাতাল করে তুলেছে।

নস্থু মদ গিলে সেদিন সন্ধ্যাবেলায় ফিরছে বাসার দিকে। ডোমরী তার মনে একটা ঝড় তুলেছে। বার বার তার হাসিটা নস্থুর কানে বেজে ওঠে।

রাতের অন্ধকারে বার বার সেই ডোমরীর কথাই মনে পড়ে নস্থুর। পথটা জনহীন। এখন আর ইষ্টিশানের সঙ্গে কারো সম্বন্ধ নেই। একাই ফিরছে নস্থু, কাঁচামাটির উপর মোরাম ফেলা একটু রাস্তা

হয়েছে এখন, কিন্তু সেটা এত খাল খন্দে ভরা ছিল না বৈকালে, নম্সু এখন একাৎ ওকাৎ করে চলেছে টলতে টলতে।

বকুল আর প্রমথকে দেখেও নম্সু ঠিক ঠাওর করতে পারে না, জড়িত কণ্ঠে বলে—কে বাবা? এখন তো গাড়ি নাই। ইষ্টিশান তো ভোঁ ভাঁ।

বকুল দেখছে লোকটাকে। মাতাল লোক দেখলে তার ভয় লাগে। প্রমথের গা ঘেসে এসে দাঁড়িয়েছে। প্রমথ বলে,

—একটু মাল-টাল খায়, ও কিছু করবে না।

নম্সু ও বড়বাবুকে চিনে নমস্কার করবার চেষ্টা করে সে চলে যাচ্ছে তার কোয়ার্টারের দিকে। বকুল তখনও দেখছে। হঠাৎ অন্ধকারেই দেখা যায় রূপসী ওদিককার কোয়ার্টার থেকে বের হয়ে এসেছে। নম্সুকে ওই অবস্থায় দেখে তার পথ আটকে দাঁড়ালো মেয়েটা।

রূপসী কিছুদিন ধরে দেখছে লোকটাকে। আগেও মদ এক আধটু খেতো, কিন্তু সেটা কোত্থেকে এনে ঘরে বসে গিলতো। এমন মাতাল হয়ে ফেরেনি। ক্রমশঃ লোকটার মদের মাত্রাও ছাড়িয়ে যাচ্ছে। আর দেখেছে এখন মুরগীর ডিমগুলোও রূপসী চোখেও দেখতে পায় না। আজও বেশ কয়েকটা ডিম ছিল, পাইকেরদের বিক্রী করে কিছু পয়সা পেতো, কিন্তু সেগুলোও উধাও হয়ে গেছে। তখন বাইরের বকশিষের টাকাটা সিকেটাও তার হাতে দিত, এখন তাও মেলে না। রূপসী তবু জোর করে মাষ্টারবাবুর সামনেই ওর মাস-মাইনেটা কেড়ে নেয়, তাই পায়। ক্রমশঃ লোকটার ব্যবহারে রূপসী অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। ডোমরীর সঙ্গে নম্সুর ঘনিষ্ঠতার কথাটাও শুনেছে সে। দেখেছে সেই নষ্টা মেয়েটাকেও। রূপসী একটা কাণ্ড বাধাবার জন্যেই তৈরী ছিল। আজ সেই সুযোগ মিলেছে রূপসীর। নম্সু ও দেখছে রূপসীকে।

নম্সু শুধোয়—কি হল তুর আবার? এ্যাঁ?

রূপসী আজ তৈরী হয়ে ছিল, লোকটা ফিরতেই তাই আজ ধরেছে

ওকে। নস্তুর বাবরি চুলের মুঠি ধরে রূপসী প্রবল বেগে কয়েকটা ঝটকা দিয়ে ছেড়ে দিতেই নস্তুর সিটকে দেহটা বার কয়েক পাক দিয়ে ছিটকে পড়তে রূপসীও তার উপর চেপে বসে ওর মাথাটা মাটিতে ঠুকতে থাকে।

নস্তু ধরাশায়ী হয়ে ওই অবস্থায় পড়েছে। ফলে নস্তুর নেশা, ডোমরীর মধুর স্বপ্নাবেশ কোনদিকে হারিয়ে যায়। রূপসী গর্জাচ্ছে —কোথায় মদ গিলছিলি হারামীর বাচ্চা ?

নস্তু প্রথম আক্রমণটা সামলে নিয়েছে। দামী নেশাটাও ছুটে গেছে, আর ওই কালো মেয়েটার হাতে অপমানিত হয়ে নস্তুর পৌরুষ জেগে ওঠে। নস্তু এবার লাফ দিয়ে গিয়ে রূপসীর গালে মুখে অন্ধের মত কিল ঘুসি চালাতে থাকে। এবার বেকায়দায় পড়েছে রূপসী।

নস্তু গর্জাচ্ছে—এত বাড় তোর! জান খেয়ে লোব মাগীর। চুপ মেরে থাকবি।

রূপসীর তেজ উবে গেছে। আর্ত কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে সে।

বকুল অন্ধকারে ব্যাপারটা দেখতে পায় না, ওদের গর্জন আর মেয়েটার অসহায় কান্না শুনেছে। প্রমথের দিকে চাইল। বলে ওঠে বকুল,

—বৌটাকে মারছে লোকটা মদ গিলে এসে ?

বকুল আশা করেছিল প্রমথ বোধ হয় এগিয়ে যাবে বৌটাকে বাঁচাবার জন্য। কিন্তু প্রমথ ওটাকে সহজভাবেই নেয়। সে বলে, —যেতে দাও। ও এমন রোজই হয়। নস্তুর বৌটাও মহা পাজি।

বকুল ওর দিকে চাইল। গাছ গাছালির ছায়া অন্ধকারে প্রমথের মুখে একটা যেন নির্মম কাঠিন্যকেই খুঁজে পেয়েছে বকুল।

তখনও রূপসীর চাপা কান্নার স্বর ওঠে নির্জন অন্ধকারে। কেউ ওকে বাঁচাতে যাবে না। অসহায় মেয়েগুলো এখানে একা নির্জনে এমনি বুক ফাটা স্বরে কাঁদবে, এ যেন অরণ্যে রোদন। নিষ্ফল— নিরর্থক। বকুলের মনে হয় হৃদয়হীন নির্জন আরণ্যক অন্ধকারে সেও

নির্বাসিত হয়েছে। ওই মানুষটাও তার বুকফাটা হাহাকারে কোনদিনই সাড়া দেবে না। বরং তাকেও ওই মাতাল নম্বুর মতই চরম আঘাত হানবে সে।

মুখ বুজে ওদের বাসায় এসে ঢুকলো বকুল। তখনও রূপসীর চাপা কান্নার সুরটা উঠছে রাতের বাতাসে।

বকুল এ কাজ গুলোয় অভ্যস্ত। পাঁচজনের সংসারে এতদিন থেকেছে। তাই বাসায় ফিরে কিছুক্ষণের মধ্যেই ময়দা মেখে জনতা ষ্টোভে পরোটা আর আলু ভাজা করে নেয়। হঠাৎ দেখা যায় গজাননকে।

লোকটার হাতে একটা বাটিতে আলুর দম। গজানন বলে—কখন থেকে দেখছি কোয়াটারে আলো জ্বলেনি। নাও বৌদি। আলুর দম বানালাম।

প্রমথ কি বলার চেষ্টা করে। গজানন অবশ্য কান দিল না। বকুলের পরোটা করা দেখে যেন খুশী হয়েছে সে। গজাননই ঘরটায় নজর দিয়ে বলল,

—ঘর সংসার পাতছো বৌদি, লক্ষ্মীর পট—ঠাকুর দেবতার পট না হলে ঘর মানায় না। আর সাঁঝ-প্রদীপ আছে?

—না তো।

বকুলের কথাটা খেয়াল হয়নি। বাড়িতে দেখেছে মা রোজ ওটা করে। সংসারের কল্যাণে ওটুকু করে সব ঘরের গৃহিণীই। বকুলের মনে হয় লোকটা যেন তাকে ঘরবাসী হবার সব পথই দেখাতে চায়। অথচ গজাননের সংসার দেখেছে, ওই পথের ধারে চালায় দোকান আর সংসার বলতে ওইখানেই। পথেরই মানুষ। গজানন বলে,

—ওসব রাখতে হয় ঘরে। সাঁঝ-পিদীম দেবে। ছোঁড়াটাকে বলে একটা তুলসীর চারা এনে লাগিয়ে দোব।

প্রমথ যেন শুনতে পায়নি কথাটা। বকুল বলে—তা ভালো!

গজানন বলে—রাত হয়েছে, খেয়ে নাও বৌদি, চলি।

প্রমথ কিছুদিন ধরে দেখেছে গজাননকে। লোকটাকে আগেও দেখেছিল।

তার এখানে আশ্রয় দিয়েছিল তখন, কিন্তু লোকটা কোনদিনই তার বোঝা হয়ে থাকে নি। তার সব কৃতজ্ঞতার ঋণ সে শোধ দিয়েছে। মায় প্রমথের বিয়ের সময় বেশ কিছু টাকার টান পড়ে যায়। প্রমথ অবশ্য দিদিকেই দিয়েছিল টাকাটা। দিদিই জানিয়েছিল মেয়ের বাবাকে দিতে লাগবে। নইলে এমন ভালো পাত্রীকে ওরা সহজে তার মত পাত্রের হাতে দিতে চাইবে না। প্রমথেরও ঝোঁক পড়ে গেছল, টাকার জন্য পিছিয়ে আসতে চায় নি। হারাতে চায়নি বকুলকে।

কিন্তু তার সামান্য পুঁজিতে তা কুলোয় নি। ওই গজাননই তখন টাকাটার ব্যবস্থা করে দিয়েছিল বনোয়ারী ঘোষকে বলে, আর গজাননকে দিয়েই প্রমথ পুরো টাকাটা দিদির হাতে পাঠিয়ে দিয়েছিল আগাম। প্রমথ দেখেছে তার বিয়েব পর থেকেই গজানন তার বাড়িতে থাকে নি, নিজে দোকান দিয়ে বসেছে, আর সেই দোকান নাকি ভালোই চলছে। ওই দোকান ঘরের খর্চা ও তার মুলধন গজানন কোথা থেকে যোগাড় করেছে সেটা কিছুটা অনুমান করতে পারে প্রমথ। ধূর্ত লোকটা দিদিকেও হয়তো সব টাকা দেয় নি। নিজের জন্যও কিছু সরিয়েছিল বোধ হয়।

মুখে কিছু না বললেও মনে মনে প্রমথ গজাননের উপর সন্দেহ করেছে। আর তাকে বিয়ের সময় এখানে এসে মাতব্বরী করতে দেখে ঠিক খুশী হয়নি। প্রমথ গজাননের ওই আজকের কথাগুলোও শুনেছে। এখনও কর্তৃত্ব করতে চায় এখানে গজানন।

বকুলকে এ সম্বন্ধে কিছু বলতে চায়না প্রমথ। ওই বিয়ের আগে তার বাবাকে টাকা দেবার কথাটাও জানায়নি। গজাননকেও নিষেধ করেছিল প্রমথ। কারণ দিদিই বার বার নিষেধ করেছে বকুল যেন এই টাকা লেনদেনের কথাটা ঘুণাক্ষরে জানতে না পারে, জানলে তার মত মেয়ে অনর্থ বাধাবে। প্রমথ আনমনে খেতে বসে।

রাত হয়ে গেছে। জানলা দিয়ে এক ফালি চাঁদের আলো এসে পড়েছে বিছানায়, বাইরে সীমাহীন দিগন্তের বিস্তার, বকুলের ঘুম আসে না। প্রমথ ক'দিন ধকলের পর আজ গভীর ঘুমে ডুবে গেছে। বকুলের ঘুম এসেছিল—কিন্তু প্রচণ্ড শব্দে চমকে জেগে ওঠে। কি যেন একটা বিজাতীয় শব্দ ওঠে রাতের অন্ধকারে। ভয় পেয়ে গেছে বকুল।

একটু নিরীখ করতে বুঝতে পারে নাক ডাকছে লোকটার। গোলমত মুখখানা হাঁ হয়ে গেছে—আর তার থেকে বিকট শব্দটা বের হয়। চকচক করছে টাঁকটা। প্রমথের ভুঁড়িটা বেব হয়ে পড়েছে। বকুল দেখছে মানুষটাকে। ওব সাবা গায়ে বুকে হাতে ঘন লোম। একটা জানোয়ারের মত দেখাচ্ছে প্রমথকে।

ওর যেন কোন সাড়া নেই, আবেগ নেই। পাশে বকুল রয়েছে সে চেতনাও নেই প্রমথের। গভীর ঘুমে সে ডুবে আছে। সকাল থেকেই ইষ্টিশানে আটকে থাকে, আবাব রাতভোর তার বিকট ঘুমের আয়োজন।

বকুল হয়তো কিছু স্বপ্ন দেখেছিল, নদীর ধারে ছায়া অন্ধকারে দেখেছিল তরঙ্গ আর সেই তরুণটিকে। ওদের মনের ব্যকুলতা তার মনেও কি সাড়া এনেছিল। কুমারীমনের গভীরে জাগে ব্যর্থতার জ্বালা। বকুল নীরব চাহনি মেলে দেখছে ওই বিচিত্র মানুষটাকে। মনে হয় ও যেন তার অচেনা। ভয় হয় বকুলের।

হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে যায় প্রমথের। বিস্মিত অচেনা চাহনি মেলে সে দেখছে বকুলকে। আবছা চাঁদের আলোয় কেমন বিচিত্র ভীত, চকিত চাউনি ওর চোখে। প্রমথ বিড় বিড করে—ঘুম আসছে না?

জবাব দিলনা বকুল। কোথায় দূরে একটা তীব্র চীৎকার শোনা যায়। পলাশ ফুল ঝোপের বাইরে একজোড়া নীল চোখ জ্বলছে কি শ্বাপদ লালসা নিয়ে। ···ভয় করে বকুলের।

—ওটা কি ? অস্ফুটস্বরে শুধোয় বকুল।

প্রমথের ঘুম জড়ান চোখের পাতায় জড়তা নামছে। বিড় বিড় করে সে—হেড়োল নেকড়েগুলো আসে নসুর মুরগীর সন্ধানে। ও কিছু নয়। ঘুমোও দিকি।

প্রমথের নাক ডাকছে। বকুল জানালাটা ভেজিয়ে দিল। মনে হয় অন্ধকারে ওই লোভী জানোয়ারটা যেন তার উপরই লাফ দিয়ে পড়বে। নির্জন প্রান্তরে ভেসে আসে অতন্দ্র রাত্রির মাঝে ডাকটা। ফেউ ডাকছে। টিক্—টিক্, একটা তিতির পাখী ডাকছে তীক্ষ্ণস্বরে। বকুলের কোথাও কোন আশ্বাস নেই।

বকুল কখন ঘুমিয়ে পড়েছিল জানে না। সকালের আলোর প্লাবনে ঘরখানা ভরে উঠেছে। প্রমথ আগেই ষ্টেশনে চলে গেছে। রূপসীর ডাকে চাইল বকুল।

গত রাতের ওর সেই কান্নাটার কথা মনে পড়ে বকুলের। রূপসী স্বামীর অত্যাচারে কেঁদে একটু হাল্‌কা হতে পারে, কিন্তু বকুলের ব্যর্থ জীবনে কান্নার প্রকাশ নেই, আছে নীরব একটা জ্বালা।

ও নিয়ে কোন কথাও জিজ্ঞাসা করে না বকুল। রূপসী এর মধ্যে চা চাপিয়েছে। গত রাত্রের বেদনার কোন প্রকাশও ওর মুখে নেই। ওরা বোধ হয় সহজ ভাবেই জীবনের এই বঞ্চনাটাকে মেনে নিয়েছে। তাই সহজ ভাবে বেঁচে আছে রূপসী।

আর বকুল তা পারে নি, তার মানসিক চেতনাই তাকে অস্থির করে তুলছে। বহরমপুর থেকে তানপুরা হারমোনিয়মটা এনেছিল। সেগুলো আর বের করার ইচ্ছে হয়নি। সুরও যেন তার জীবনে ফুরিয়ে গেছে। বকুলের মনে হয় এই ব্যর্থ জীবনকে রূপসীদের মত মেনে নিতে হবে বিনা প্রতিবাদে। স্বামী নামক কোন একটা নিষ্ঠুর হৃদয়হীন মানুষের সব অবহেলা অত্যাচারকে মুখবুজে বিনা প্রতিবাদে সহ্য করে যেতে হবে। এ ছাড়া পথের সন্ধান সে জানে না। তরঙ্গের কথা মনে হয়। তাকেও বাইরে ভালোবেসে ঘর বাঁধার স্বপ্নে মত্ত হতে দেখেছে বকুল।

—কই গো বউদি! তরঙ্গ ঢুকছে দুধের পাত্র নিয়ে।

রূপসী বলে—ছুঁড়ির কি নাড়িতে টান ধরে না? চায়ের কেটলির শব্দ শুনতে পাস?

—তা যা বলো! তরঙ্গ হাসছে।

তরঙ্গের দিকে চেয়ে থাকে বকুল। কাল বৈকালের দেখা সেই থমথমে বেদনাহত চাহনি ওর চোখে নেই। বাইরে ষ্টেশন প্লাটফর্মে কার গানের সুর শোনা যায়। রূপসী বলে তরঙ্গকে—ছোঁড়ার তো দেখছি গান বেরুচ্ছে রে? একসাথে এলি বুঝি মাণিকজোড়। দেখালি কিস্তুক!

তরঙ্গ বলে—নসুদাকেও দেখলাম, তা রাত ভোর কি তোমরাও গান গেয়েছো?

রূপসীর খেয়াল হয়, এই সময় নসুর কিছু আমদানী হয় ইষ্টিশানে। আর কালকের সন্ধ্যার পর থেকে রূপসী ঠিক করেছে ওই রোজকারের বাড়তি পয়সাটা নসুর হাত থেকে ছিনিয়ে নেবে, যাতে মদ গিলে মাতাল না হতে পারে। আর ও কথাটা কানে এসেছে, ওই ডোমরী ছুঁড়ির কথা। ছুঁড়িটা কোন কোলিয়ারীর দিকে গেছল। মরদটার সঙ্গে ছোড়ছাড় করে ফের এখানেই ফিরে এসেছে। আর নসুর পিছনে ঘুরছে। রূপসী তাই চটে উঠেছে।

তরঙ্গের কথায় রূপসী বলে—মিন্‌সের গান ছুটিয়ে দোব এবার। আর তোকেও বলি তরঙ্গ, ছোঁড়াটার সঙ্গে ওই ফষ্টি নষ্টি ছাড়। মরদগুলো সবই কুকুরের জাত—নজর কেবল এঁটো পাতের দিকে। মুরোদ তো বোঝা গেছে ওদের।

বকুল চুপ করে থাকে। হাসছে তরঙ্গ—কেন গো? নসুদার আবার রং ধরেছে নাকি?

রূপসী উনুনে আঁচ দিয়ে বলে—রং ছুটিয়ে দোব না। বউদি, আঁচ উঠুক, আমি ইষ্টিশান থেকে মাছ তরকারী নিই আসি পাইকেরদের কাছ থেকে। রূপসী আসলে নসুর ওই কাঁচা পয়সাগুলো হাতিয়ে

এবার জব্দ করবে তাকে। তাই রূপসী বের হয়ে গেল ওই ছল করে।

চায়ে চুমুক দিয়ে চলেছে বকুল। ওর ভাবনাগুলো কেমন যেন জট পাকিয়ে যায়। পুরুষদের সম্বন্ধে রূপসীর ধারণার কথা ও শুনেছে। তরঙ্গ দেখছে বকুলকে। বকুল শুধোয়—ছেলেটা কে রে?

—কে গো! তরঙ্গ এড়াবার চেষ্টা করে।

তবু তরঙ্গ চমকে ওঠে বকুলের কথায়। ওর মুখে একটু লালচে আভাস জাগে! তরঙ্গ ওর দিকে চাইল। বকুলের চোখে সহজ হাসির আভা ফুটে উঠেছে। বকুলও বুঝেছে তরঙ্গের মনের ভাবটা।

তাই শুধোয় – ওই যে গান গাইছে? ও কে? চিনিস না ওকে?

তরঙ্গ বলে—ভজন। বিষণপুরের ভজন।

—ওর সঙ্গেই কাল নদীর ধারে এসেছিলি?

বকুলের কথায় মেয়েটা চমকে ওঠে। ওর কথার স্বরে ভয়ের গাঢ়তা। তরঙ্গ জানে ওই খবরটা প্রকাশ পেলে এখনি তার অপমান লাঞ্ছনার আর কিছু বাকী থাকবে না। তাই তরঙ্গ ধরা পড়ে গিয়ে আর্তস্বরে বলে—একথা কাউকে বলো না বউদি! আমি ওখানে আসতে চাইনি।

হাসছে বকুল—ন্যাকা! তা কতোদিন চেপে চেপে রাখবি রে? চিরকাল তো এভাবে চলবে না। জানা জানিও হবে, তখন?

তরঙ্গের ডাগর দু'চোখ জলে ভরে ওঠে। বকুল অবাক হয়ে শোনে তরঙ্গের কথাগুলো। ওর ব্যর্থ শূন্য জীবনের কথা। কাউকে ভালোবাসার কোন অধিকারই তার নেই, কিন্তু তবু তার জীবনে সেই চরম বেদনাটুকুই এসেছে।

বকুল চমকে ওঠে—তোর বিয়ে হয়েছিল, আর সব খুইয়ে বসে আছিস এর মধ্যে?

তরঙ্গের দু'চোখের জল বাধা মানে না। এটা তরঙ্গের জীবনে একটা চরম বিপর্যয়। ওই বিস্মৃতপ্রায় একটা ঘটনা তরঙ্গের জীবনে কি

দুঃসহ জ্বালা এনেছে। তরঙ্গ বলে ওঠে কাতরস্বরে সেই ভাগ্যহীনতার কথাটা।

—আমি তখন জানতাম না কিছু। আমার অজানতেই সেদিন আমার সব হারিয়ে গেল।

—তাই বলে এসব করবি? বকুল বলে ওঠে।

বকুল ভাবছে ওর কথাটা। জানায় তরঙ্গ—ভজন বলে, ওসব মানি না। নিজের জমি জারাত আছে—গরু মোষ আছে। আমরা ঘর পাতবো নোতুন করে। কারোর তোয়াক্কা করি না।

তরঙ্গ বুকচাপা আর্তনাদের মতই বলে—এটা অন্যায়, পাপ, মহাপাপ। সব জানি। ওকে বোঝাতে পারি না বৌদি। আমার জন্যে ও দুঃখ পাবে।

—আর তুই? বকুল তীক্ষ্ণস্বরে প্রশ্ন করে।

তরঙ্গ বলে—আমার বুকটা জ্বলে পুড়ে যায় বৌদি। বাবা শুনলে আছড়ে পড়বে। আর ওদিকে ভজন। সেও কষ্ট পাবে। আমার পথ কি জানি না। এক একসময় মনে হয় নিজেকেই শেষ করে দিই। সব জ্বালা জুড়োক।

তরঙ্গের ডাগর চোখ দুটো কি গভীর বেদনায় কানায়-কানায়-ভরা নদীর মত উছলে ওঠে। সমাধানের পথ বকুলও জানে না। সেও সমাজের অনুশাসনে বন্দী হয়ে এই নিঃস্ব নির্বাসনকে মেনে নিয়েছে। নিজের মুক্তির পথই সে জানে না। তাই তরঙ্গকেও কিছু বলার মত কথাও তার নেই। বকুল চুপ করে কি ভাবছে।

তরঙ্গ বলে—চলি বৌদি! বেলা হয়ে গেছে। এখনও দু'বাড়ি দুধের রোজ সেরে ডাক্তারবাবুর কাছ হয়ে ফিরতে হবে বাড়িতে।

বকুল শুধোয়—ডাক্তারবাবুর কাছে যেতে হবে কেন রে?

তরঙ্গ জানায়—বিষনপুরের গোপাল ডাক্তারের কাছে যেতে হবে। বাবার শরীরটা ভালো নেই। ওষুধপত্র নিয়ে যেতে হবে।

তরঙ্গ চলে গেল। একাই বসে আছে বকুল। মনটা কেমন ভারি হয়ে আসে।

রূপসী আজ নস্বুরামকে বেকায়দায় ফেলেছে। রূপসীকে প্লাটফর্মে দেখে নস্বু একটু সরে যাবার চেষ্টা করে, এসময় প্লাটফর্মে লোকজন তরকারী, দুধ, কিছু মাছ নিয়ে সহরে যায়। তাদেরও ভিড় রয়েছে। নস্বুকে সকলেই চেনে। মাল ওজন করা, বুক করার কাজে নস্বুর সাহায্যের দরকার আর নস্বুও কিছু বকশিষ পায় তাদের কাছ থেকে। রূপসী নস্বুকে দেখে এগিয়ে গিয়ে ওকে ধরেছে। কথা বলার আগেই রূপসী ওর জামার পকেটে খপ্ করে হাত ঢুকিয়ে টাকা পয়সাগুলো ছিনিয়ে নেয়, নস্বু বাধা দেবার অবকাশও পায়নি। তবু প্রতিবাদ করে।

—এ্যাই। কাজের সময় দিক্ করছিস কেনে?

হাসছে প্লাটফর্মের লোকজন, তরকারীর ব্যাপারীরা। রূপসী গর্জে ওঠে নস্বুর কথায়,

—চোপ! মদ খেয়ে নেশা করার জন্যে পয়সা?···কি! জবাব দে মরদ?

নস্বু কিছু করার আগেই রূপসী তার পকেট সাফ করে ফেলেছে। মেয়েটা যেন কালকের সন্ধ্যার সেই ব্যাপারটার প্রতিশোধ নিয়েছে এই ভাবে।

নস্বু বাধা দেবার চেষ্টা করতে পারে নি নানা কারণে।

ভজনও দেখেছে ব্যাপারটা। সে বলে—ঠিক করেছো ভাজবৌ, নস্বুদার ওই ওষুধ।

নস্বু চুপ করে গজরাচ্ছে। রূপসী তার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করতে পেরে মনে মনে খুশী হয়েছে। ভজনের কথায় বলে,

—তাই বলো দিকি লোকটাকে।

রূপসী ইতিমধ্যে কিছু বেগুন নোতুন মুলো আনাজপত্র ও সওদা করে চলেছে।

ডোমরী প্লাটফর্মের ওদিকে দেখেছে ব্যাপারটা। রূপসীকে ওই মেজাজ নিয়ে আসতে দেখে মেয়েটা সরে গেছে।

তাই নম্বুর এই অবস্থাটা ডোমরী দূর থেকেই দেখল মাত্র।

রূপসীও দেখেছে তাকে। আর তার জন্যই রূপসী বেশ চড়া গলায় নম্বুকে শোনায়—ফের যদি কুন বদখেয়াল দেখেছি, তুর নাক আমি রগড়ে দুব কিন্তু।

নম্বু চুপকরেই রাগ অপমান সব সয়ে যায়। জানে এখানে এর জবাব দিতে গেলে একটা মহা কেলেঙ্কারী হয়ে যাবে। রূপসী নম্বুকে শাসিয়ে তরি-তরকারী মাছ যা পেয়েছে তাই নিয়ে এবার বড়বাবুর বাসার দিকে ফিরে যায় বিজয়িনীর মতই।

হঠাৎ বাসায় ঢুকতে গিয়ে রূপসী কার কথাবলার শব্দ শুনে থমকে দাঁড়ালো। একটু অবাকই হয়েছে রূপসী। বড়বাবু এসময় ইষ্টিশানে, আর ছোকরা ছোটবাবু ঠিক এই সময়েই ওর বাসায় এসে প্রমথবাবুর নোতুন বৌ এর সঙ্গে জমিয়ে গল্পের আসর ফেঁদেছে। রূপসীর ব্যাপারটা কেমন কেমন ঠেকে।

বকুল কদিনেই এই নির্জনতার মাঝে এসে হাঁপিয়ে উঠেছিল। কথা বলার লোক ও তেমন কেউ নেই। তরঙ্গ আসে সকালে কিছুক্ষণের জন্য, আর রূপসীর সঙ্গেই বা কি কথা বলবে। প্রমথবাবু ওই ইষ্টিশান আর কাজ নিয়েই আছে। হাঁপিয়ে উঠেছিল বকুল। এমনি নিঃসঙ্গতার মাঝে দেখেছিল বকুল ওই নিখিলকে। নিখিল এসেছিল দেখা করতে—

নোতুন এসেছেন তাই ভাবলাম একটু দেখা করে আসি। কেমন লাগছে জায়গাটা?

বকুল হাসল বসুন। —আপনার কেমন লাগছে এখানে?

নিখিল বলে—আমি তো হাঁপিয়ে উঠেছি। পালাই পালাই ইচ্ছে করে, কিন্তু চাকরী বলে কথা তাই পড়ে থাকতে হয়।

বকুলের মনে হয় নিখিলও তারই মত নিঃসঙ্গ। তাই

হয়তো আলাপটা সহজ হয়ে ওঠে। মাঝে মাঝে নিখিল আসে এখানে।

বকুল রূপসীকে ওই সব নিয়ে ফিরতে দেখে চাইল। নিখিল জানায়,

—রূপসী কিন্তু সত্যিই কাজের।

বকুল হাসল। ও জানায়—রূপসীর জন্যে তবু খেতে পাচ্ছি। তা হ্যাঁরে ইষ্টিশানে চেঁচাচ্ছিলি কেন?

রূপসী গজরায়—ওই ঘরের মানুষটার জন্যে।

রূপসী ছোটবাবুকে জমিয়ে বসতে দেখে খুশী হয় নি। ওই ছোটবাবুই তাকে ইষ্টিশানের ঝাড়ুদারের চাকরীটা দিতে গড়-বড় করেছিল আর ওই ডোমরীকে বলেকয়ে কাজটা পাইয়ে দিয়ে নস্তুরই ঘাড়ে ওই পেত্নীকে চাপিয়ে দিয়েছে। নস্তুটারও বদখেয়াল বেড়েছে, আর কপাল পুড়তে বসেছে রূপসীর।

রূপসী গজরায়—পুরুষের ওই ছোঁক ছোঁক স্বভাব আমার বাপু ভালো লাগে না। আমাদের ঘরের মানুষটার কথা বলছি। খেংরে বিষ ঝেড়ে দোব একদিন।

হাসছে নিখিল ওর কথা শুনে।

বকুল ওই প্রসঙ্গ থামাবার জন্য বলে—একটু চা চাপা দিকি ছোটবাবুর জন্যে। আমাদের জন্যও একটু কর।

রূপসী মুখবুজে চায়ের জল চাপালো।

ছোটবাবু আর বৌদি কি গল্প করছে। রূপসী ওদিক থেকে এদের কথাগুলো কান পেতে শোনার চেষ্টা করে।

ছোটবাবুকে রূপসীর বেশ ভালো লাগে না। ছোকরা বাবু তাকে প্লাটফর্মে দেখলে বকাঝকা করে। মাঝে মাঝে দেখেছে রূপসী ছোটবাবুও ডোমরীর সঙ্গে ফষ্টি নষ্টি করে, আর নস্তুরাম যেন গলে পড়ে মেয়েটাকে দেখে। রূপসীর কোন কিছুই নজর এড়ায় না।

ডোমরী কোন কাজ-কর্ম্মো বিশেষ করে না। এটা সেটা সাফ-সুতরো করে। একটু ঢগে ঢগে ঝাঁটা বুলিয়ে আর গতর দুলিয়ে নাকি

রোজ নিয়ে যায়। সব মিলিয়ে ছোটবাবুকে ভালো-লাগেনা তার, আর এখানে ছোটবাবুকে চেয়ারে বসে গল্প জমাতে দেখে মনে মনে আরও চটে উঠেছে রূপসী। তবু বকুলের কথায় চা বানাতে বসেছে রূপসী রান্নাঘরে।

নিখিল সহরের ছেলে, সেও এখানে এসে যেন নির্বাসনে রয়েছে। ওপাশেই তার কোয়ার্টার। বিয়ে থা করেনি। একাই থাকে আর গজাননের ওখানে দুবেলা খাওয়ার ব্যাপারটা সেরে নেয়। নিখিল বলে।

—রিয়েলি, গজুদা একটা দারুণ লোক, রান্না যা করে, ফাইন। ওই দীঘিতে চান করে আম গাছের নীচে বসে, পদ্মপাতায় ডাল ভাত বড়ি পোস্ত আর মাছের টক যা লাগে—অপূর্ব। রাতে অন্ধকার নামে—টিনটিম করে একটা বাতি জ্বলে। মনে হয় কোথায় হারিয়ে গেছি। কলকাতার ছেলে, এখানে যেন দম বন্ধ হয়ে আসে।

বকুল দেখছে ওকে। কলকাতার সম্বন্ধে তার মনে একটা স্বপ্ন রয়ে গেছে। ভেবেছিল সেও ওই মহানগরীর জীবনে জড়িয়ে পড়বে। গানের জগতে নাম করবে। নিখিল ওর গানের কথা শুনে অবাক হয়।

—বাঃ তানপুরা—হারমোনিয়াম এনেছেন দেখছি। তবলাও রয়েছে? দেখবো একটু?

নিখিল যেন এখানে কি সম্পদের সন্ধান পেয়েছে।

বকুলের ওইগুলো ছিল অত্যন্ত প্রিয়। এখানে আসার সময় ওগুলোকে ফেলে আসতে পারেনি। বকুল নিখিলের দিয়ে চেয়ে থাকে। নিখিল ততক্ষণে তানপুরার খোল থেকে সাবধানে তানপুরাটা বের করে নিপুন হাতে তারগুলোকে যোয়ারীর ওপর থেকে টেনে সুর বাঁধতে থাকে।

নিখিল বলে,—অনেকদিন সব ভুলে গেছলাম। এখানে এসে ভাবতাম অনেক অপরাধ করেছি, তাই এই নির্বাসন। এত কালের গানবাজনার চর্চা সব ভুলে গেছি বোধহয়, তবু এসব দেখে আজ সত্যি ভালো লাগলো।

আটটার গাড়ি পার হয়ে গেছে। এর মধ্যে অন্যদিন বাড়ি থেকে একবার চা আসে। সকালের গাড়ীর ঝামেলা বেশী। মালপত্র কিছু বুকিং থাকে। টিকিটও বিক্রী করতে হয়। সকালের দিকে কাজের চাপ থাকে প্রমথের। তবু প্রমথ এ সবের মধ্যে ডুবে থাকতে ভালোবাসে। সকালের বাজারগাড়ি চলে যাবার পর টিকিট সেল, মাল বুকিং এর সব ষ্টেটমেন্ট করে সামলে নিতে ঘণ্টাখানেক চলে যায়। তারপরের ট্রেণ বেলা এগারোটায়। সেটাতে কাজ কিছু কম থাকে। এই ফাঁকে বাসায় গিয়ে চা-পর্ব আর একবার সেরে আসে প্রমথবাবু।

প্রমথ উঠতে যাবে, ইঞ্জিনের শব্দে চাইল। কোলিয়ারী সাইডিংএ খালি রেক টেনে নিয়ে যাবে ইঞ্জিনটা। সাইডিং লাইনে পয়েন্ট দিতে হবে, সময় লাগে। ভূষণ রায় ড্রাইভার এই ফাঁকে একটু জিরিয়ে লাইন ক্লিয়ার নিয়ে চলে যায় কয়েক মাইল দূরের খাদানের দিকে, ফেরে অন্য লোডেড ওয়াগনগুলোকে টেনে নিয়ে।

ড্রাইভারকে দেখে প্রমথ বলে—রায়বাবু যে, সান্টিংএ চলেছেন ?

ওদের পরিচিতি, পদবীটাতেই। নামগুলো উহ্য থাকে। ভূষণ বলে, —যাই, মাল বইতে। কাল দেখলাম নোতুন বৌদিকে ! তা বেশতো। বেশতো জিনিসটি জুটিয়েছো ভটচাযদা !

অবাক হয় প্রমথ। কোথায় দেখলো লোকটা বকুলকে ঠাওর করতে পারে না প্রমথ। ভূষণের সম্বন্ধে দু'চারটে কথাও শুনেছে। লোকটা মালটাল খায়। অবশ্য ওরা ওভার টাইমের অনেক পয়সাই পায়, আর কাঁচা পয়সা হাতে এলে ওসব হয়েই থাকে। ভূষণ বলে—তোমার গিন্নী ওই গজুর দোকানে বসে চা খাচ্ছিল বৈকালে। মনে হল লেখাপড়াও জানেন টানেন। তাই বাপু ভয়ে আলাপ-টালাপ করিনি, কি বলতে কি বলবো ডেরইভার মানুষ।

প্রমথ খবরটা শুনে একটু অবাক হয়। এর মধ্যে তার অজান্তে

বকুল গজাননের দোকানের বেঞ্চে বসে চাও খেয়েছে। ভূষণের কথায় কোনরকমে জবাব দেয় প্রমথ।

—মানে, সহরের মেয়ে, স্কুল ফাইন্যাল পাশ কিনা।

ভূষণ পানে জরানো দাঁত বের করে খ্যাঁক খ্যাঁক করে হেসে বলে। —আমি তো বাবা মিস্ত্রী ড্রাইভার, কথা বললেই মাল কট্‌ হয়ে যাবো।

ব্যস। দাদা তাহলে অপিসের সবকিছু কাজকর্ম টিকিট কাটার হিসেবও শিখিয়ে দাও বৌদিকে। তুমিতো গায়ে হাওয়া লাগিয়ে চাকরী করবে। কই নিখিলকে দেখছি না?

প্রমথ জানায়—তার রাত ডিউটি। এখন রেষ্ট। বোধহয় নিজের বাসাতেই রাখছে।

ভূষণ ড্রাইভার একটা বিড়ি ধরিয়ে দুচার টান টেনে দমনিয়ে বলে —দেখো দাদা, তুমি আবার নাইট ডিউটি নিওনা। নোতুন বৌদিই চটে উঠবে কিন্তু!

ওর কথাগুলো প্রমথের ঠিক ভালো লাগে না। জানে সকলের হাঁড়ির খবরগুলো নিয়ে ডিভিশন অফিসে অন্য ইষ্টিশানেও আলাপ আলোচনা হয়। দত্তবাবুর বৌ কার সঙ্গে চলে গেছে—সে খবরটাও এদের কাছে মুখরোচক, জংশনের হেডক্লার্ক সরসীবাবুর মেয়ে কোন গার্ড সাহেবের সঙ্গে বেরিয়ে গেছে—তাও সারা লাইনের লোক জেনে ফেলেছে।

ভূষণ তবু বলে—ভোজটাতো দিলেন না, বৌদির হাতের চা-ই একটু হোক আজ। আলাপ-সালাপ ও করে যাই।

প্রমথ ওর দিকে চাইল। লোকটাকে চটাতে চায় না। তাই ওর মুখ বন্ধ করার জন্যই প্রমথ ব্যাপারটাকে হাল্‌কা করে দেখতে চায়। বলে সে—চা খাবে আর এমন কি কথা! চলো আলাপ-সালাপ ও হবে।

পয়েন্টসম্যানকে রেখে ষ্টেশনঘর বন্ধ করে ওরা সামনের চড়াই এর উপর কোয়ার্টারের দিকে এগোলো। প্রমথ বলে,

—এখন ও রান্নার কাজে ব্যস্ত। ভূষণ বলে,

—তবু দেখা তো হবে।

হঠাৎ দরজার কাছে এসে থমকে দাঁড়ালো প্রমথবাবু, ঘরের ভিতরে সুর উঠছে আর তবলার নিপুণ হাতের বোলও চলেছে সেই সঙ্গে। বকুলের সুরেলা গলার মাধুর্যটুকুতে প্রমথ খুশী হয়নি, বরং চমকে উঠেছে বকুলের ব্যবহারে। ভূষণও অবাক হয়—গান শুনে—

এ্যাঁ। রেগুলার গান বাজনার আসর বসে গেছে ভটচাযদা এর মধ্যে কোয়াটারে? এযে জমাটি ব্যাপার।

প্রমথ ঘরে ঢুকেই দেখে নিখিল তন্ময় হয়ে তবলা বাজাচ্ছে, আর বকুল যেন আজ অন্য কোনজন। ওর নরম মুখে মিষ্টি হাসির মাধুর্য্য। দুচোখে না বলা একটু তৃপ্তির আভাস।

বকুল আজ এই বাঁধন নির্বাসনের নিঃসঙ্গতা ভুলে তার কুমারী জীবনের মুক্তির আস্বাদটুকুকে ফিরে পেয়েছে। হারিয়ে গেছে তার সুরের রাজ্যে।

অবাক হয়েছে প্রমথ। তার আড়ালে এবাড়িতে বেশ বিচিত্র ঘটনাই ঘটে এটা তার জানা ছিল না। নিখিল যে এখানে আসে এখবরও জানতো না প্রমথ। এসব দেখে নিজেই অবাক হয়েছে সে। ভূষণ ড্রাইভার এর মুখে চোখে হাল্‌কা হাসির ছোঁয়া জাগে।

প্রমথের মুখচোখের ওই পরিবর্তন সেও দেখেছে।

ওদের পায়ের শব্দে সচকিত হয়ে চাইল নিখিল। প্রমথবাবু তাকে দেখছে বিচিত্র চাহনি মেলে। ভূষণ রায়ও একটু যেন অন্য কিছুর সন্ধান পেয়েছে। বকুল বাধা পেয়ে তানপুরা নামিয়ে ওদের দেখছে।

ভূষণই নিজের পরিচয় দেয়—ড্রাইভার মানুষ, ওসব গানের মর্ম বুঝিনা বৌদি, তবে ভালো লাগলো। প্রমথদা সত্যিই ভাগ্যবান।

বকুল দুহাত তুলে নমস্কার জানায়, মনে পড়ে কাল বৈকালে ওকেই দেখেছিল গজাননের দোকানে। ভূষণ রায় বলে,

—রইলেন এখানে চেনা জানা হবে। তা নিখিলবাবু যে গানবাজনা জানেন তা তো শুনিনি!

নিখিল বলে—সুযোগ পেলাম কই এখানে? একটু বাজাচ্ছিলাম মাত্র।

বকুল এর মধ্যে উঠে গিয়ে রূপসীকে দিয়ে চা তৈরী করিয়ে নিজে চা বিস্কুট নিয়ে আসে। প্রমথ দেখছে বকুলকে। তার কাছে এই গানের ব্যাপারটাও কেমন রহস্যের মত ঠেকে। একটু আগেই বহু অভিজ্ঞ ভূষণ রায়ও কি যেন একটা ইঙ্গিত করেছিল। প্রমথ বকুলের দিকে চেয়ে কিসের সন্ধান করছে। আনমনে চা বিস্কুট নিল সে।

নিখিল বলে চলেছে—বৌদি সুন্দর গান জানেন কিন্তু প্রমথদা। আমি তো ভাবিনি যে এত ভাল গাইতে পারেন।

—হুঁ! প্রমথ বিস্কুট চিবুতে চিবুতে আনমনে মাথা নাড়লো। ভূষণ হুপ হুপ করে গরম চাটা গিলে চলেছে। সে বলে,

—সময় নেই, আবার সান্টিং ইঞ্জিন নিয়ে দৌড়তে হবে কয়েক মাইল দূরে ওই বন পাহাড়ের দিকে। নাহলে একটু বসে গান শুনতাম।

বকুল বলে—ওই পাহাড়ের নীচে অবধি যান?

ওটা যেন তার কাছে দূর অজানা রহস্যের মতই হাতছানি দেয়। ওই বিরাট নিঃসঙ্গতার মাঝে মৌনতার প্রতীক ওই পাহাড়টা—তার মাথায় সাদা বিন্দুটা রোদে ঝিকমিক করে। বকুলের মনে হয়, ওখানে কি এক মুক্তির আস্বাদ আছে। আলোর ঠিকানা রয়েছে। এখান থেকে ওই দূরের দিকে চেয়ে থাকে বকুল।

ভূষণ রায় বলে—ওরই এপাশে যাই। ওদিকটা গভীর জঙ্গল। ছোট পাহাড়ি নদী পার হয়ে যেতে হয়। ওই কদম দ' বয়ে আসছে ওই পাহাড়ের থেকেই। সুন্দর জায়গা। পাহাড়টা ও বেশ বড়। বন ও গভীর।

…প্রমথই জানায়—ওখানেই তো পরেশবাবুর জঙ্গলের ইজারা। ওই কাঠ চালান যায় এখান থেকে।

বকুল কি খুশিতে বলে—পরেশবাবুর কথা তো অনেক বলো।

তোমার খুব বন্ধু শুনি। ওখানে চলো না একদিন বন পাহাড় কখনও দেখিনি।

প্রমথ পরেশের কথা উঠতে চুপ করে যায়। পরেশ সম্বন্ধে বকুলকে ওই কথা বলতে প্রমথ যেন ভাবনায় পড়েছে। তাছাড়া বেপরোয়া পরেশকে ও কেমন যেন ভরসা করতে পারে না প্রমথ, প্রমথকে চুপ করে থাকতে দেখে ভূষণই জানায়,

—চলুন না, ট্রেন সাইডিং থেকে বেশী দূরে নয়। জিপ আছে কোলিয়ারীর। সকালে গিয়ে বিকেলে ফেরা যায় এখানে। ওই জায়গাটাও সত্যিই সুন্দর।

প্রমথের দিন ডিউটি : ছুটিও নেই। নিখিল বলে,—চলুন না, পরেশবাবুর ট্রাক তো যাতায়াত করে। ফেরা যাবে।

নিখিলের কথায় ভূষণ একটু অবাক হয়। প্রমথবাবুও। বকুলের ওদের ভাবান্তরের দিকে খেয়াল নেই। তাই বলে সে কলকলিয়ে—চমৎকার হবে। আমার খুব ইচ্ছে করে ওই পাহাড়টায় উঠতে অনেক উঁচুতে ওই মন্দিরে যেতে।

...দেরী হয়ে যাচ্ছে। ভূষণ প্রমথ বের হয়ে আসছে। তাকে সাইডিং এ ইঞ্জিন নিয়ে যেতে হবে। নিখিল বলে।

—চলি বৌদি। রাত জেগে শরীরটা ভালো নেই। চান খাওয়ার পর একটু ঘুম লাগাতে হবে। দেখি গজাননদা আবার কি মেনু করেছে আজ।

ওরা চলে গেল। বকুলের মনে আজ চকিত খুশির আভাষ জাগে। নিখিলের সঙ্গে চেনাশোনা হয়ে মনে হয় একটু মুক্তির আশ্বাস যেন পেয়েছে সে এই বনবাসের নির্জনতায় তাই সে ওই দূরে হারিয়ে যেতে চায়।

প্রমথ দুপুরে গুম হয়ে ফেরে। হঠাৎ তার ভাবনাগুলো কেমন এলোমেলো হয়ে যায়। ভেবেছিল শান্ত এই ঘরে বিয়ে করে একজনকে

এনে সুখী হবে সে। কিন্তু মনের অতলে একটা কি কালোছায়া যেন গুমরে উঠছে। কতকগুলো ঘটনা দ্রুত গতিতে ঘটে চলেছে আর সেই ঘটনাগুলোর কথা আগে সে জানতো না। প্রকাশ্যে প্রমথ কিছু বলতেই পারে না। কিন্তু মনের মাঝে তাই আলোড়নটা বড় হয়ে ওঠে।

বকুলের স্নান হয়ে গেছে। ছিপছিপে দেহখানায় কচি কলাপাতা রং-এর শাড়ি পরা, ব্লাউজের রংও শাড়ির সঙ্গে ম্যাচ করিয়ে পরেছে। একরাশ কোকড়ানো চুল পিঠ ঝাঁপিয়ে পড়েছে। গুণগুনিয়ে গান গাইতে গাইতে আলনায় ভিজে শাড়িটা মেলছে, সারা দেহে একটা ছন্দ জাগে। দেহের রেখাগুলো সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে।

বকুল ওকে দেখে মাথায় কাপড়টা একটু টানবার ব্যর্থ চেষ্টা করে বলে—বেলা অনেক হয়ে গেছে, স্নান সেরে নিতে হবে না?

প্রমথ খেতে বসেছে। আজ বকুল অনেক হাল্‌কা, মনে হয় এই জায়গাকে মেনে নিতেই পারবে সে, পারতে হবে। প্রমথ খেতে বসেছে। দেখছে বকুলকে। বকুলও নিজের খাবার বাড়ছে। ভাবছিল বকুল, প্রমথ তাকেও এক সঙ্গে খেতে বলবে। একা একা খেতে ভালো লাগে না। এক সঙ্গে কথা বলতে বলতে খাওয়া যায়। কিন্তু প্রমথ বকুলের মনের সেই সামান্য চাওয়াটুকুর খবর ও রাখে না। প্রমথ যেন নিজের কথাটাই ভাবে সব সময় অপরের কথা ভাবার কোন দরকার নেই তার। প্রমথ বোধ হয় ভাববে ওকে পেটুক বলেই, স্বামীকে না খাইয়ে কোন সতী সাধ্বী স্ত্রীর খেতে নেই। অথচ একা একা খেতে তার ভালো লাগে না।

প্রমথ চুপচাপ খেয়ে উঠে হাত ধুয়ে ঘরে চলে গেল। দুপুরের একটু সময় তার ঘুমোনো অভ্যেস। বকুলের মনে হয় প্রমথের ভুড়িটাও হয়েছে ওরই জন্যে।

বকুল প্রমথ খেয়ে ওঠার পর নিজে খেতে বসলো। ভাতগুলো ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। কোনরকমে একা একা দুমুঠো খেয়ে উঠে পড়লো বকুল। প্রমথের তখন নাক ডাকার শব্দ আসে।

বকুলের দুপুরে ঘুমুনোর অভ্যাস নেই। চারিদিক নিস্তব্ধ, পাখীগুলো কলরব করে ছায়াঘন আমবাগানে। একা একা বিশ্রী লাগে। বইপত্তর বিয়ের সময় কিছু পেয়েছিল সেগুলো সব পড়া হয়ে গেছে। এখানে কোন লাইব্রেরীও নেই। কথা কইবারও কেউ নেই। প্রমথ যেন নিজের জগৎটুকুকেই চেনে, তার আশপাশের কারো দিকেই নজর তার নেই। বকুল প্রমথকে দু'একবার ডাকার চেষ্টা করে কিন্তু সাড়া নেই তার। দুপুরে বারবার বাপের বাড়ির কথা মনে পড়ে। মনটা খারাপ হয়ে যায়। হৈ হৈ করে বোধ হয় এখন বুলা মিনির দল সিনেমায় চলেছে। সহরের ছবিঘরগুলোতে বোধহয় নোতুন ছবি এসেছে। সিনেমার খবর ও রাখেনি অনেক দিন। খবরের কাগজও আসে না এখানে। ওই রেডিওটাই সম্বল। সবসময় তাও ভালোলাগে না।

বকুল বের হয়ে পড়ে বাইরে। রোদের তাপ এ ধুঁকছে দিগন্ত জোড়া বন্ধুর মাঠ প্রান্তর। হঠাৎ চোখ পড়ে—পলাশ বনে কিসের ইশারা জেগেছে। লাল হাল্‌কা গোলাপী আভা জাগে। আম গাছের সবুজ পাতার আড়ালে থোকা থোকা আম ঝুলছে, ওগুলো বড় হয়ে উঠছে, পাতাঝরা মহুয়ার ফুল ফোটার পালা ফুরিয়ে গেছে। আবার এসেছে ডালে ডালে কচি পাতার সমাবেশ।

গজাননের দোকানে বড় কড়াই-এ কাঁচা শালপাতা চাপা দিয়ে ঘুঘনির মটর কলাই সেদ্ধ হচ্ছে। বাচ্চা চাকরটা গামছা মুড়ি দিয়ে ঘুমুচ্ছে। এখন খদ্দেরপত্র নেই। গজানন একটা চারপাই-এ বসে পুরোনো স্টীল ফ্রেমের চশমা লাগিয়ে কি একটা বই পড়ছে। ওদের এই সময়টুকু অবকাশ মেলে। তা ছাড়া বৃহত্তর জগতের সব বাঁধন কাটিয়ে এই জায়গায় নির্জনে এসে ওরা বোধহয় সান্ত্বনা খুঁজে নিয়েছে। বারবার মনে হয়েছে বকুলের ওরা পেরেছে সেটা, কিন্তু বকুল পারেনি।

হঠাৎ একটা শব্দ শুনে চাইল। দমকা হাওয়ায় পাতাগুলো নড়ছে, দু-একটা আম পড়ছে এদিকে ওদিকে। সেদিকে তার নজর নেই,

বকুল এখানে নোতুন একটা জিনিষ দেখেছে। ওই চড়াই-এর গা বয়ে মোরাম ঢালা পথ বয়ে একটা ট্রাক আসছে, কাঠ বোঝাই ট্রাক। ওদিকের গাছের নীচে প্লাটফর্মের ধারে কাঠের গাদা জমে আছে। ট্রাকখানা ওদিকে গিয়ে থামলো। কয়েকজন কুলি ট্রাক থেকে নেমে ওই কাঠের স্তূপগুলো খালাস করছে। বোধহয় চালান যাবে ট্রেনে।

বকুল ওই ধূলিধূসর ট্রাকখানার দিকে চেয়ে থাকে। খেয়াল হয় আমগুলো ডাল থেকে পড়ছে, তাতে খুশী নয় বকুল, পাথরের টুকরোর অভাব নেই এখানে। বকুল দু-একটা পাথরের টুকরো তুলে নিয়ে আমের থোকাগুলোর দিকে ছুঁড়তে থাকে। একটা লাগলো না—তেমন জোরও ছিল না। বকুল পরের পাথরটা বেশ জোরেই ছুঁড়েছে আর একটা থোকায় লেগে আমগুলো ছিটকে পড়লো। বকুল কি খুশী ভরে দৌড়ে গিয়ে কুড়োচ্ছে ছিটিয়ে পড়া আমগুলো।

—শুনছেন। এই যে!

কার ডাকে চমকে উঠে চাইল বকুল। শাড়িখানার বেশ কিছুটা কোমরে জড়ানো। রোদের উষ্ণতায় মুখখানায় ঘাম জমেছে, চুলের লতিতে অসংযত বন্যতা।

বকুল চোখ মেলে ভদ্রলোককে দেখে অবাক হয়েছে। হঠাৎ এখানে বিনা নোটিশে এমনি প্যাণ্ট সার্ট পরা কোন ভদ্রলোক এসে পড়বে ভাবতে পারেনি। কোমরের শাড়িটা খুলে বকুল একটু স্বাভাবিক হবার চেষ্টা করে। ভদ্রলোক চোখের গগলস্‌টা খুলে সাদা চোখে দেখছে মেয়েটিকে।

বকুলের সহজ সাবলীল ভঙ্গীটা ভদ্রলোকের চোখে ক্ষণিকের জন্য একটু বিচিত্র সাড়া এনেছে। মাথায় পানামা হ্যাট, ওর প্যাণ্ট সার্ট দেখে মনে হয় লোকটা কর্মঠ। লোকটার ফর্সা রং রোদে পুড়ে জলে ভিজে তামাটে হয়ে উঠেছে। নিটোল পেটা শরীর। দীর্ঘ ঋজু দেহে নীরব ব্যক্তিত্বের ছাপ ফুটে উঠেছে। বকুল ওর চাহনির সামনে বিব্রত বোধ করে।

ভদ্রলোক বলে—প্রথমবাবু আছেন ?—মাষ্টার বাবু। ঘাড় নেড়ে বকুল ওর দিকে চাইল। ভদ্রলোক বলে,

—এখানে আপনি বোধহয় সবে নোতুন এসেছেন ? বলুন গে —মীরপাহাড়ি থেকে পরেশবাবু এসেছেন। উনি স্টেশনে নেই দেখে এদিকে এলাম।

প্রমথবাবু ঘুমিয়ে পড়েছিল, কিন্তু ওর ঘুমও ঘড়ি-মত চলে। তিনটার আগেই একটা মালগাড়ির সিডিউল আছে, ওদিকে ভূষণ রায় ইঞ্জিন নিয়ে ফিরবে। ওরা যদি তাকে স্টেশনে না পায় ডিভিশনেও গল্প করবে। আর সেদিন থ্রি-ফরটি মালগাড়ির গার্ড তো বলে, এখন তো প্রমথ ডিউটি দেবে বাড়িতে হে, স্টেশনে লগ্-ফগ্, করো না বাপু। অবেলায় বিয়ে তায় কচি বৌ বেচারা।

প্রমথ ওই চুকলিখোর লোকগুলোকে বিশ্বাস করে না। ওরা নানা কথা বলে। প্রমথের ঘুম ভেঙ্গে যেতেই দেখেছে বকুল নেই। দুপুরে সন্ধ্যায় বৈকালে কোথায় যেন যায় সে! হঠাৎ বাইরে ট্রাকের শব্দে উঠে পড়ে প্রমথ। পরেশবাবুর কাঠ চালান আসছে বোধ হয়। লোকটার দিল আছে আর জানে প্রমথ, পরেশের ওয়াগনের ব্যবস্থা হয়ে গেলে খুশীতে আর বন্ধুত্বের দাবীতে বেদম খানা-পিনার আয়োজন করে ফেলে পরেশ। পরেশ এলে প্রমথ খুশী হয় নানা কারণে। একটু মুক্তির আভাষ পায় সে। ঘুম ভেঙ্গে দেখে বকুল নেই। প্রমথ কি ভেবে জানলাটা খুলে বাইরের দিকে চেয়েই চমকে ওঠে।

পরেশ আর বকুল পাশাপাশি দাঁড়িয়ে রয়েছে, কিঁ কথা বলছে। বকুলের চোখে মিষ্টি একটু আভাষ জেগেছে।

বকুল হাল্কা হাসিভরা মুখে পরেশকে কি বলছে। প্রমথই ধড়মড়িয়ে উঠে পড়ল, মুখেচোখে জল দিয়ে বাইরে এসে বলে।

—আরে পরেশবাবু যে। এসো-এসো।

পরেশবাবু সিগ্রেটটায় টান দিয়ে বলে।

—কি ব্যাপার হে প্রমথ, এ্যাঁ—তুমি ঘুমুচ্ছো আর উনি বিরহিনীর

মত একা একা কুঞ্জবনে ঘুরে বেড়াচ্ছেন? এ্যা! কেমন বিচিত্র ঠেকছে।

বকুল একটু লজ্জা বোধ করে। প্রথম বলে ওঠে।

—তোমার কথাবার্তা চিরকালই অমনি রয়ে গেল। এসো ভিতরে এসো। কি খাবে চা, না সরবৎ?

পরেশ বেশ দরাজ গলায় বলে।

—কিসের দরকার তাতো জানোই আর এখানে তা মেলে না। দ্রব্য আমার সঙ্গেই আছে। ডোণ্ট মাইণ্ড। ব্যস্ত হতে হবে না।

সাইড ব্যাগ থেকে একটা বোতল বের করে দাঁত দিয়ে ছিপিটা কামড়ে খুলে গলায় ঢালতে থাকে সেটা। বকুল অবাক হয়ে দেখছে বিচিত্র এই মানুষটাকে। একদমে বেশ খানিকটা গলায় ঢেলে যেন শান্ত হয় লোকটা। টক টক গন্ধ ওঠে। বাকী বোতলটা প্রমথের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলে—ট্রাই এ ড্রপ। ভালো জিনিষ। ফ্রেস্।

বকুল দেখছে লোকটাকে। প্রমথ একটু শিউরে উঠে বলে। ওসব চলে আমার? নোতুন হচ্ছো দেখছি—

পরেশ হাসছে হা হা করে, বাকী তলানিটুকু গলায় ঢেলে বলে—

—বিয়ের খবর অবশ্য পেয়েছি ছাট ভূষণ ড্রাই-ভারের কাছে। কি আর মিলবে এখানে, কি নাম যেন তোমার? ওই বৌঠান-টৌঠান বলতে আমার ভাল লাগে না।

পরেশ চেয়ার টেনে নিয়ে বসে পড়ে কথাটা বলে।

বকুল কিছু জবাব দেবার আগেই প্রমথ ওর নামটা জানায়—বকুল।

—বকুল। পরেশ নামটা বিড় বিড় করে ওর দিকে চাইল। বকুল দেখছে মানুষটাকে। খাড়া রোদে এতটা পথ ট্রাকে আসার জন্য না ওই তাজা বিয়ারের ঠেলায় চোখ দুটো লালচে হয়ে উঠেছে ঠিক বুঝতে পারে না। তবু কেমন ভয় ভয় করে বকুলের।

পরেশ বলে চলেছে, বকুল। গুড নেম, সুইট নেম। মনে পড়ে প্রমথ কবিতাটা?

ঝরা বকুলের কান্না ব্যথিবে আকাশ।

সেইক্ষণে খুঁজে দেখো—

কিছু মোর পিছে রহিল সে।

তোমার প্রাণের প্রান্তে।

বকুল দেখছে বিচিত্র মানুষটাকে। ওর আবৃত্তির মধ্যে একটা বেদনার মীড়কে ছুঁয়ে চলেছে ওর কণ্ঠস্বর। হঠাৎ পরেশ আবৃত্তি থামিয়ে বলে ওঠে।

—থাক! ওঠো প্রমথ, ওয়াগনের ব্যাপারটার একটু খবর নিতে এসেছিলাম। আজ আসানসোল যাচ্ছি বৈকালের গাড়িতে। ফিরে এসে আলাপ হবে বকুলের সঙ্গে। ওদিকের মাল খালাস কত দূর হল দেখতে হবে।

প্রমথও পরেশকে বেশীক্ষণ এখানে যেন রাখতে চায় না। তারও দেরী হয়ে গেছে। তাই কোটটা চাপাতে চাপাতে বলে—চল।

প্রমথও পরেশকে একটু ভয় করে আজ।

বকুল বলে ওঠে—পরেশবাবু ঝড়ের মত এলেন, এখুনিই বের হয়ে যাচ্ছেন? এককাপ চাও—

হাসল পরেশ—ঝড়ের মতই জীবন যে। পরে আলাপ হবে। সেদিন কিন্তু হাতের রান্নাও খেয়ে যাবো। চলি—

বকুল দেখছে বিচিত্র ওই মানুষটি, কেমন যেন খাপছাড়া ও। রূপসীও এসে পড়ে। উনুন ধরিয়ে এঁটো বাসন-পত্র মাজতে মাজতে বকে চলেছে আপনমনে। পুরুষগুলো যে একদম বাজে আর হ্যাংলা সেই কথাটাই ঘোষণা করে। আরও জানায় রূপসী—মরদ আজ ঘরে যায়নি। মর না তুই-তারপর দেখবো আমি।

—কে রে? বকুল ওদের জীবনের সুখ-দুঃখের মাঝে ও জড়িয়ে গেছে। তাই রূপসীকে শুধোলো কথাটা।

রূপসী ফুসে ওঠে-কে আবার! ওই ঘরের মানুষটা? তা বাপু স্বোয়ামীর রোজকারের পয়সা ইস্ত্রিতে নিয়েছে, তোর এত টিমোক

কিসের র‍্যা! বলে কিনা—প্লাটফরম ভর্ত্তি লোকজনের সামনে ওকে হেনস্থা করেছি সকালে। যাঃ। যাঃ।

বকুল চুপ করে শুনছে রূপসীর কথাগুলো। কাল রাতে ওর কান্না আর নস্থর মাতাল হয়ে মারার কথা ও ভোলেনি। বকুল বলে,

—ওতো মারধোর করে তোকে মদগিলে।

রূপসীর কালো মুখখানা আর কুতকুতে দুচোখে যেন একটু পৌরুষ আর কি ভালোবাসায় মাখানো নরম চাহনি ফুটে ওঠে। রূপসী বলে —লোকটা এমন ডাকাবুকো গ! তা পুরুষ ব্যাটা ছেলে একটুন ডাকাবুকো জাঁহাবেজে না হলে চলেঁ?

গলা নামিয়ে রূপসী বলে—তবে ভালোবাসে বৌদি। আর আম্মো ও ছেড়ে কথা কইনা'গ। রাগ তো চণ্ডাল।

বকুল ওদের জীবনের গভীর ভালোবাসার নোতুন কি অর্থ খোঁজে। এই সংজ্ঞাটাকে সে জানে না।···রেডিওতে একটা রবীন্দ্র সঙ্গীতের সুর ওঠে। হঠাৎ উৎকর্ণ হয়ে শুনছে সে।

মনটা ওই সুরের ভেলায় যেন কোন দূর সীমাহীন শূন্যতার মাঝে উধাও হয়েছে।

প্রমথ নোতুন দেখা ওই বেপরোয়া মানুষটার কথাও ভুলে গেছে বকুল। ওই সুর তাকে এ জগত থেকে কোথায় দূরে নিয়ে গেছে।

বৈকালের আলো ভরা আমবন—শান্ত পলাশ-এর রং-লাগা দিগন্ত, মৌমাছির গুণগুণ সব যেন ওই সুরে মিশে আছে। ওই গান তার চেনা, সুরও। গঙ্গার ধারে শিমুল গাছে রক্তলাল ফুল ফোটে-বাঁশগাছের পত্রাবরণে এসেছে হলুদ আভা। ওই সুরগুলো বার বার বকুলের মনে যেন ঝড় তোলে, হাহাকার আনে।

—বৌদি।

বকুল চমকে উঠে চাইল। নিখিল এসেছে। বৈকালে বোধ হয় স্নান সেরেছে সে। নিখিল বলে।

—চলুন। পলাশবনের দিকে যাবেন না? বৈকালে জায়গাটা সত্যিই সুন্দর। একটু ঘুরে আসবেন।

রূপসী চাইল ওর দিকে। বকুলের ঘরে মন টেঁকে না। তাই বলে—একটু দাঁড়াও।

শাড়িটা বদলে নিয়ে মুখে গালে একটু পাউডার বুলিয়ে বকুল বের হয়ে পড়ে। রূপসীকে বলে—কাজ হলে চাবি দিয়ে যাবি, পরে আনিয়ে নোব।

রূপসী যেন খুশি হয়নি। জোরে জোরে বাসনটা ঘসতে ঘসতে গজরায়—চললেন হাওয়া খেতে! হয়েছে যা হোক! রূপসীর কাছে এই চাঞ্চল্যের কোন যুক্তিই নেই।

বনোয়ারীর মনে হয় কদিনে যেন বয়েসটা হঠাৎ অনেক বেড়ে গেছে' সংসারের যে হালটা এতদিন শক্ত করে ধরেছিল সেই মুঠিটা আলগা হয়ে গেছে। একটা অনেক বড় বিশ্বাস ছিল বনোয়ারীর মনে সেই বিশ্বাসের ভিত্তিমূলে একটা কঠিন আঘাত এসে তাকে চৌচির করে দিয়েছে। কথটা শুনে বনোয়ারী বিশ্বাস করেনি প্রথমে।

কিশোরীকে তাই তরঙ্গের সম্বন্ধে ভজনকে জড়িয়ে নানা কথা বলতে দেখে বুড়ো গর্জে ওঠে।

—ওই মেয়েটার নামে এতবড় অপবাদ দিস্ তোরা? ও তো তোদের সংসারে দাসীগিরি করে খায়। তাকে নিয়ে এত বদকথা কেন?

· বাসিনীও এসে পড়েছে। মদন কথাটা শুনে বেশ চড়ামেজাজেই বলে—

—ওসব নষ্টামি সইবো না। লাশ দাখিল হয়ে যাবে কিন্তুক যদি বেচাল দেখি।

বনোয়ারী ধমকে ওঠে—থামবি গাড়োল কোথাকার! ঘরের কেচ্ছা

নিয়ে হাটে হাঁড়ি ভাঙ্গতে যাস্‌নে। আগে সত্যি মিথ্যে বুঝে ত্থাখ তারপর ও কথা বলবি।

ভজন জানেনা ব্যাপারটা। সকালেই দুধের যোগান নিয়ে আসে বনোয়ারীর এখানে। ভোর বেলায় ঘোষ গরুও দুইতে হয় লোকজনদের নিয়ে।

তরঙ্গের ঘুম ভেঙ্গে যায় ভোরেই।

এবাড়ির বড়বৌ বাসিনী মদনের বৌ এর ঘুম তখনও ভাঙ্গেনি। ভাঙ্গলেও তারা বিছানা ছেড়ে ওঠেনা। তরঙ্গকেই উঠে সকালের সংসারের প্রাথমিক কাজগুলো করতে হয়।

তরঙ্গ দেখেছে মায়ের আমল থেকে ঘর দরজায় জল দিয়ে গোয়াল নিকিয়ে তবে অন্য কাজ। তরঙ্গের মনে সেই বৈকালের কথাগুলো বার বার মনে পড়ে। ইষ্টিশানের বৌদির কাছেও বলেছে কথাগুলো। কিন্তু সমাধানের কোন পথই পায়নি সে। মনে হয় ভজনকে এড়িয়ে চলবে। সরেই থাকবে সে ভজনের কাছ থেকে।

কিন্তু উপায় নেই। তরঙ্গ ভোরের আবছা আলোয় গোয়ালের ওদিকে কাকে দেখে দাঁড়ালো। ভজনও খুঁজছে তরঙ্গকেই।

দুদিনেই এখানের কাজের হাল বদলে গেছে। ভজন বুঝেছে কিশোরী, মদন দুজনেই যেন তাকেই চোর সাব্যস্ত করেছে। ওজন কম হওয়ার ব্যাপারে কাল যা তা কথা শুনিয়েছে। ভজন সেগুলো ভোলেনি।

মদন বলে ওঠে—চুরি না করলে মাল যাবে কোথায় রে ভজন?

বনোয়ারী চুপ করে বসে শুনছে কথাটা। ভজন বলে,

—চুরির বেত্তান্ত জানি না মদন। মাল কম ছিল তাই বলছি।

কিশোরী সায় দেয়—তুই তো সাধু মহাপুরুষ রে! বাইরে কেনে—ঘর থেকেই দুধ বাইরে যায়, আর সেই দুধ তোর নামে এসে জমা হয় ফের এখানের খাতায়।

ভজন চাপা রাগে গর্জে ওঠে—ঘোষমশায় এসব কথা কেন বলবে কিশোরীদা?

বনোয়ারীকে সেইই যেন নালিশ করতে যায়। অন্য সময় বনোয়ারীও তার হয়ে কথা বলেছে, কিন্তু আজ বনোয়ারী জবাব দিল না। উঠে গেল আড়ত ঘর থেকে। কিশোরীর হাতেই যেন বিচারের ভার তুলে দিয়েছে বনোয়ারী।

ভজনের মনে হয় একাজে জবাবই দেবে। এখানে আব আঁসবে না এই অপমান সইবার জন্য। সেও গোঁয়ার মানুষ, হয়তো হাত চালিয়ে বসবে এবার।

কিন্তু তরঙ্গের ব্যাপারটার একটা মীমাংসা না করে ভজন বেরুতে পারে না এখান থেকে।

ভজন আজ ভোরে সেই কথাটাই বলতে এসেছে তরঙ্গকে। ভজন এই অপমানের শেষ করতে চায়, তাই আবছা অন্ধকারে তরঙ্গকে দেখে এগিয়ে যায়, ভোরের পাখীগুলো কলরব করছে; বাতাসে বাতাপি ফুলের গন্ধটা তখনও ভারি হয়ে আছে। ভজন জানে এসময় তরঙ্গ একা থাকে।

—তরঙ্গ। ভজন তাই এসেছে এখানে।

ওকে দেখে তরঙ্গ চমকে ওঠে। ভজন বলে,

—এখানের ঝিগিরি আর কতোদিন চলবে? আমাকেও এবার চোর সাব্যস্ত করতে চায় কিশোরী। যা তা অপমানও করেছে কাল। ভাবছি চলে যাবো এখান থেকে।

তরঙ্গ ওর দিকে বেদনাহত চাহনি মেলে চাইল। ভজনের মুখেচোখে কি বেদনার ছায়া জড়ানো। নিজের জন্য নয়, তরঙ্গ আজ ভজনের জন্যই দুঃখ বোধ করে।

. ভজন বলে—তোমার জন্য এসব সয়েছি তরঙ্গ। তাই বলছিলাম আর নয়। তুমি কথা দাও। সব ব্যবস্থা করে ফেলবো আমি।

তরঙ্গ কি জবাব দেবে জানেনা। বার বার আঁধার আকাশে এসেছে এমনি মিথ্যা আলোর ইশারা, বাঁচার আশ্বাস। কিন্তু কি জবাব দেবে তরঙ্গ জানেনা। চমকে উঠেছে তরঙ্গ।

—ভজন! একি বলছিস তুই! এ হয় না।

তরঙ্গ ভজনকে যেন তার অক্ষমতার কথাটাই জানাতে চায় এই নিভৃত নির্জনে। ভজন ওকে আজ হারাতে চায় না।

হঠাৎ কার চাপা গর্জনে চমকে ওঠে তরঙ্গ। ভজন ফিরে চাইল। তরঙ্গ দেখে ওই আবছা অন্ধকারে এসে পড়েছে তার বাবা, পিছনে কিশোরী আর মদন।

মদন লাফ দিয়ে এসে ভজনের জামাটা ধরে অতর্কিতে তার মুখেই দু'একটা ঘুসি চালিয়ে দেয়। ভজন ইচ্ছে করলে মদনকে ছিটকে ফেলে দিতে পারতো, কিন্তু তা করেনি। নীরবে ওই মারটা সহ্য করে যায়। কিশোরীও একটা লাথি মেরেছে ভজনকে।

অস্ফুট আর্তনাদ করে ওঠে তরঙ্গ।

—ওকে মেরো না ছোড়দা! বাবা!

বনোয়ারী চেয়ে দেখছে ওদের। দুচোখে ওর অসহায় বেদনাত দৃষ্টি!···সব তার গোলমাল হয়ে গেছে, হারিয়ে গেছে সব বিশ্বাস।

মদন গর্জাচ্ছে—মারবে না? লাশ দাখিল করে দোব ব্যাটার!

ভজন গুম হয়ে দাঁড়িয়ে মারটা সহ্য করে চলেছে।

কিশোরী ধূর্ত লোক। সেই ই বলে—ছেড়ে দে মদন।

ও জানে ভজন রেগে গেলে এইখানেই তাদের দু'জনকে ঘায়েল করে রেখে যাবে।

মদন ভজনকে ছেড়ে দিয়ে গর্জায়।

—এতবড় বাড় তোর! আমাদের বংশের মুখে চুণকালি দিবি?

ভজন জবাব দিল না। ঠোঁটটা কেটে গেছে। রক্ত ঝরছে। জিবে লেগেছে সেই নোনতা রক্তের স্বাদ। একরাশ থুথু রক্ত ছিটিয়ে ভজন ধীরে ধীরে সরে এল ওখান থেকে।

মদন এবার তরঙ্গের চুলের মুঠিটা ধরে ঝাঁকানি দিতে থাকে—খুন করে ফেলবো নষ্টামি দেখলে।

তরঙ্গ যন্ত্রণায় অস্ফুট আর্তনাদ করে। ও তেমন কিছুই করেনি,

ইচ্ছে করলে আজও তরঙ্গ ওদের ওই তুচ্ছ মান সম্মান পায়ে দলে ওদের বংশমর্য্যাদার ফানুষটাকে ফাটিয়ে চৌচির করে দিতে পারে ভজনের সঙ্গে বের হয়ে গিয়ে। কিন্তু এখনও তা সে করেনি ওদের মুখ চেয়েই।

বনোয়ারী অস্ফুট কণ্ঠে আর্তনাদ করে।

—এ তুই কি করছিস মুখপুড়ি? আমার উঁচু মাথা ধুলোয় মিশিয়ে দিবি?

তরঙ্গ জানায়—কিছুই করিনি বাবা। তোমরা আমার কথা বিশ্বাস করবে না তা জানি তবু কথাটা বল্লাম।

মদন গর্জায়—চুপ করে থাকবি! না'লে তোকেই খতম করে দোব।

—তাই কর ছোড়দা। এ আমি সইতে পারছি না। তরঙ্গ রুখে উঠেছে আজ।

কি নিদারুণ অভিমানে হতাশায় বনোয়ারীর বুকটা যেন দীর্ণ হয়ে যায়। ও বলে—থামবি তোরা!

বনোয়ারী সরে গেল। কোনরকমে গিয়ে বিছানায় পড়েছে বনোয়ারী।

বেদনায় অপমানে তরঙ্গ অশ্রুভিজা স্বরে বলে ওঠে—বিশ্বাস করো বাবা, কোনো অন্যায় আমি করিনি।

কিন্তু তরঙ্গের সে কথা ওরা বিশ্বাস করেনি।

—থাক আর সতীপনায় কাজ নাই!

বাসিনী তীক্ষ্ণ কণ্ঠে মন্তব্য করে। গোলমাল শুনে সেও এসে পড়েছে বিছানা ছেড়ে। বাসিনীর মুখ-এর ধার জানে তরঙ্গ। কোনরকমে টলতে টলতে তরঙ্গ বাড়ির ভিতর এসে দুঃসহ কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে। সকালটা কি তীব্র বেদনায় বিষিয়ে উঠেছে।

বকুল চায়ের দুধও পায়নি। রূপসী গজগজ করে—ঢলানিকে খুব যে মাথায় তুলেছো বৌদি! দেখি ইষ্টিশানে যদি দুধ মেলে।

বকুলও বলে—তাই গ্যাখ, তরঙ্গতো এল না দেখছি।

প্রমথ আজ বাধ্য হয়েই গজাননের চা খেয়েছে। রূপসী প্লাটফর্মে আসতে নস্থু আজ সাবধান হয়ে যায়। তার আগেই যা কিছু পেয়েছিল পয়সাকড়ি সে সব নিরাপদ জায়গায় চালান করে দিয়েছে। রূপসী দেখে ডোমরী আপনমনে কাজ করছে। ব্যাপারটা ডোমরীও টের পেয়েছে।

নস্থু যে ওই খাণ্ডার মেয়েটাকে ভয় করে তা জেনে ডোমরীও রসিকতা করে ওর সঙ্গে—

তোর দবনকত্তা আইছেরে লস্থু? আবার আমাকেই ঠেঙ্গাবেক নাই তো হে? আমার ওপর তো রাগ বেশী!

ডোমরী ওদিকে চলে গিয়ে ঝাঁট দিতে থাকে।

নস্থু মনে মনে চটে উঠেছে রূপসীর উপর। মনে হয় এবার প্রকাশ্যেই একদিন কথাটা জানিয়ে দেবে। দরকার হয় ছোড়ছাড়ই করে দিয়ে ডোমরীকে নিয়ে ঘর বাঁধবে। কিন্তু নানা কারণে তা পারেনি নস্থু।

আজ আগেই পয়সাকড়ির বেশীটা সরিয়ে দিয়ে বাকী কিছু পয়সা রূপসীকে ডেকে হাতে তুলে দেয় নস্থু।

—নে। টাকাটা রাখ।

রূপসী মনে মনে খুশি হলেও শুধোয়—এই শুধু!

নস্থু বলে—আজ বনোয়ারী ঘোষের চালান কম। গ্যাখ না ভজনও আসে নাই দুধ নিয়ে।

রূপসীর খেয়াল হয় ভজনও আসেনি।

প্লাটফর্মে অনেকেই রয়েছে। বনোয়ারীর ভাইপো অন্য লোকজনও রয়েছে। কিন্তু ভজনকে দেখেনা।

তরঙ্গ, ভজন কেউই আসেনি। রূপসীর মনে হয় একটা যেন কি গোলমালই হয়েছে।

রূপসী ওদিকে তরকারীওয়ালাদের কাছে কচু, বেগুন, পেঁয়াজকলি,

আনাজপত্র নিয়ে দুধের সন্ধানে এগিয়ে গেল গোয়ালাদের বাঁকগুলোর দিকে।

রূপসীকে দেখে ওরা চাইল। তাকে ওবা সকলেই চেনে। দুধেরও অভাব হয় না। ট্রেনের দেরী আছে তখনও। প্লাটফর্মে ওদের কথা শুনে রূপসী কান খাড়া করে থাকে। ঠিক বুঝতে পারে না তবে বনোয়ারী ঘোষ শয্যা নিয়েছে তার খুবই অসুখ, এটাই শুনতে পায় রূপসী।

তরঙ্গের জন্য বকুলও ভাবছিল। ওর মনে হয় কে জানে একটা কিছু বিপদই ঘটেছে, তাই রূপসীর কাছে বকুল তরঙ্গের বাবার অসুখের খবর শুনে বলে—বেচারা মেয়েটার বরাতই মন্দ! বাবাকে নিয়ে ও ভুগছে।

রূপসীও শোনায়—ভাই ভাজবৌগুলো তো শুনেছি মহাপাঁজী। ওই বুড়ো বাবাই দেখে ভাল করে মেয়েটাকে। বুড়ো গেলে ওর দুখের অবধি থাকবে না।

বকুলের মনে হয় কথাটা সত্যি। আর তরঙ্গ ওই বাপের মায়াতেই পড়ে আছে ওখানে সব অপমান সয়ে। মেয়েটার জন্য দুঃখ হয়। তবু ওর বাবা ভালো হয়ে উঠুক।

ট্রেনখানা প্লাটফর্মের ছড়ানো যাত্রীদের নিয়ে চলে গেছে সহরের দিকে। গজাননের দোকানেও এ সময়টা বেচাকেনা কমে আসে। গজাননও কথাটা শুনেছে। কিশোরী নিজে আজ গঞ্জে গেছে, কিশোরী যাবার মুখে গজাননের দোকানে বসে চা খেতে খেতে শোনায় খবরটা। গজাননই বলে—ভজনকে দেখছি না বড়বাবু? মালপত্র আপনি নিয়ে চলেছেন যে?

ইদানীং কিশোরী ওই ডাকটা পছন্দ করে। আর গজাননও কিশোরীকে খাতির করে একটু। এই জায়গাটা তাদেরই। কিশোরী ভজনের কথায় বেশ কঠিন স্বরেই বলে,

—ব্যাটা হারামজাদা চোর! বাবা ওকে বিশ্বাস করেছিল, তারই

সুযোগ নিয়ে একেবারে শেষ করে দিত, তা আমার চোখ এড়াবে ব্যাটা? ওর জারিজুরি সব ধরে ফেলতেই ভজন সরে গেছে।

—তাই নাকি।

গজানন একটু অবাক হয় খবরটা শুনে। ভজনকে সেও চেনে। ছেলেটা গোঁয়ার, কিন্তু চুরি করার মত নীচ সে হবে না। তবু কিশোরীর কথায় প্রতিবাদ করে না। বরং সায় দেয় গজানন কিশোরীকে খুশি করার জন্য।

—দিনকাল খারাপ বড়বাবু, কাউকেই বিশ্বাস করার জো নাই। তা শুনছিলাম কত্তার শরীর ভালো নাই?

কিশোরীর কাছে সেটা কোনো গুরুত্বপূর্ণ খবর নয়। কিশোরী আজ নিজের হাতে সব কর্তৃত্ব পাবার স্বাদ পেয়েছে। গজানন যে তাকে খাতির করছে এটা ভেবে খুশী হয়েছে কিশোরী।

সিগ্রেট ধরিয়ে একটা লম্বা টান দিয়ে দোকানের মাচায় বসে কিশোরী আজ নোতুন পাওয়া অনুভূতিগুলোকে তারিয়ে তারিয়ে পরখ করছে তৃপ্তিভরে। ওর কথায় বলে—

গোপাল ডাক্তার দেখছে। মানে বয়সও হোল। আর শরীরের দোষ কি বলো?

অর্থাৎ কিশোরীবাবুও চায় তাদের পিতাঠাকুর যেন মানে মানে এইবার পথ দেখেন।

ট্রেনখানা এগিয়ে আসছে বাঁকের মাথায়। লাল আগুন রং-ধরা পলাশবনের বুক চিরে কদম'দ ব্রিজের উপর চাকার ঝমঝম শব্দ তুলে ট্রেনখানা আসছে। কিশোরী চলে গেল প্লাটফর্মের দিকে।

ভজন সকালেই বাড়ি থেকে বের হয়ে এসেছে মনের জ্বালা চেপে। মদনের ওই মার—কিশোরীর অপমানের জবাব দিতে পারেনি। তরঙ্গের জন্যই সব মুখ বুজে সয়ে এসেছে। দাঁড়ায়নি পথে, ক' বছর কাজ করছে ওখানে বেশ কিছু টাকাও রয়েছে বনোয়ারীর কাছে সেগুলোর

কথা পরে ভাববে। এখন বের হয়ে সোজা নিজের বাড়িতেই ফিরছে ভজন।

বেলা হয়ে গেছে—কদম'দ নদীর ধারে তখনও ঘন গাছগাছালির ফাঁক দিয়ে রোদ এসে পড়েনি। পলাশ-এর ডালগুলোয় লাল রং মুছে আসছে। চারিদিকে আসছে খর রৌদ্রের নিষ্করুণ নিঃস্বতা। ভজন এই জায়গাটা চেনে, তরঙ্গ আর সে আসতো এখানে। এখনও ভজন ভাবে তরঙ্গ আসবেই। আর তাকে নিজের ঘরে এনে সে ওই মদন আর কিশোরীর এই অপমানের জবাব দেবে।

–নদীর জল পার হয়ে ভজন ইস্টিশানের দিকে চাইল।

সাতটা বাইশের গাড়ির খবর হয়ে গেছে। প্লাটফর্মে লোকজন রয়েছে। ওদের সামনে আজ যেতে চায় না ভজন। অনেক কথাই উঠবে হয়তো। ভজনের মনের অবস্থাটা ঠিক নেই। বাড়ির দিকেই চলছে সে ষ্টেশনের পথ ছেড়ে। মনটাও ভালো নেই তার।

বুড়ি পিসিমাই ভজনের সংসারের হালটা ধরে রেখেছে। গরু-বাছুর, জমি-জারাত-এর হেপাজত করে সেই-ই। আর দিনরাত গজগজ করে ভজনের সংসার সে বুঝে নিক, বুড়ি আর এসবে থাকবে না।

আজ পিসি ভজনকে সকালেই ফিরে আসতে দেখে অবাক হয়ে চাইল। এখন তার গঞ্জে যাবার কথা। বুড়ি এত করে বলেও ওই দিনভোর খাটুনির কাজ থেকে ছাড়িয়ে আনতে পারেনি। আজ ওকে এ সময় ফিরতে দেখে চাইল। ভজন বাড়ি ঢুকে দাওয়ায় বসে জানায় পিসীকে।

—কাজটায় জবাব দেই এলাম পিসি।

বুড়ি যেন কথাটা বিশ্বাস করতে পারে না। তার কানেও এসেছে ভজন আর ওই বনোয়ারীর মেয়েটাকে জড়িয়ে দু'চার কথা। ভজনের পিসীর মনটা বিষিয়েছিল। আজ ভজনের কথাটা যেন বিশ্বাস করতে পারেনা। তাই বলে—জবাব দিয়েছিস চাকরীতে?

ভজন এত দুঃখেও হাসছে আজ। পিসীর কথায় শুধোয়।

—বিশ্বেস হচ্ছে না বুঝি? তোমার কথাই মানলাম পিসী। ওদের চাকরী আর করবোনাই বলে এসেছি।

পিসী খুশী হয়ে বলে।

—বেশ করেছিস বাবা। নিজের জমি-জারাত দ্যাখ। নিজেই গরু-বাছুর, দুধেল মোষই কিনে ব্যবসা কর। তা নয়, ব্যাটাছেলে পরের দোরে কি কাজ বাছা? বেশ করেছিস, অমন চাকরীতে নুড়ো জ্বেলে দিই।

ভজন বুড়ির দিকে চাইল। বুড়ি বলে—মুড়ি দুধ দিই। খেয়েদেয়ে মাঠে যা। বীজধান ছড়াচ্ছে একটু দেখ ভাল করে আয় হবে।

বুড়ি আজ থেকেই তাকে কাজে নামাতে চায়। ভজনের ভালো লাগে না এসব। বলারও উপায় নেই। তাই ভজন উঠে পড়ে। পিসীকে শোনায়।—খাবো না এখন। মাঠ ঘুরে এসে মুড়ি খাবো।

কোনো রকমে বাড়ি থেকে বের হয়ে পড়েছে ভজন। একা একা ঘুরছে। পায়ে চলা পথ ধরে চড়াই-এর মাথায় আম বাগানের দিকে এগিয়ে আসে। জানে ভজন তরঙ্গ আসবে দুধের যোগান দিতে ইস্টিশানে। ওকে দেখার জন্যই চলেছে ওই দিকে কি দুর্বার আকর্ষণে ওই ছায়াঘন পথ দিয়ে।

গাছগাছালির ফাঁক দিয়ে চেয়ে থাকে রেল কোয়ার্টারের দিকে। একটা সুর ওঠে। বকুল সকালে এখন রেওয়াজ করতে বসে। নিখিলও এসে জোটে বকুলের ওখানে।

ভজন থমকে দাঁড়ালো, ওই সুরটা তার কাছে একটা নীরব বেদনার ছায়া এনেছে। তরঙ্গ বোধহয় আসেনি এখনও। এসে চলে গেছে কিনা তাও জানে না। কিন্তু দেখেছে ভজন ট্রেনটা বের হয়ে যাবার পর তরঙ্গ এগিয়ে যায় ওই পথ ধরে তাদের গাঁয়ের দিকে। ওর নিটোল

দেহের ছন্দটা আজ যেন এখানে গরহাজির। পথেও দেখেনি তরঙ্গকে। তবে কি তরঙ্গও আসেনি আজ?

হঠাৎ রূপসীকে দেখে চলে আসছে ভজন। মেয়েটা চেনে ওকে। ও বেশ জানে কেন এখানে এসেছে। তরঙ্গের সন্ধানেই ঘুরছে সে। রূপসীও সেটা বুঝেছে।

রূপসী দেখে ভজন এখানে না দাঁড়িয়ে গজাননের দোকানে গিয়ে বসেছে। উস্কোখুস্কো চেহারা, চোখের দৃষ্টিতে একটা শূন্যতা ফুটে ওঠে।

গজানন ভজনকে দেখে চাইল। গজানন শুধোয়,

—এ সময় কেন তুই এখানে?

গজাননের প্রশ্নে ভজন বলে,

—ওই কাজ ছেড়ে দিলাম বাঠাউর।

গজানন ওকে দেখছে। ছেলেটার দেহ-মনের উপর যেন একটা ঝড়ই বয়ে গেছে। গজাননের মনে হয় একটা কিছু ঘটেছে, আর কিশোরীর কথাটা ঠিক নয়। তাই বলে গজানন—কে নাকি বলছিল তুই ঘোষমশায়ের অনেক টাকা চুরি করেছিস?

ভজন রাগল না। হেসে ওঠে, বিষণ্ণ করুণ সেই হাসি। ভজন শোনায়,

—ওসব তো বলবেই গ! তবে তুমি বেরাহ্মণ—তোমার কাছে বলছি, চুরি আমি কানাকড়িও করিনি।

গজানন শুধোয়,—তাহলে অন্য ব্যাপার কিছু আছে বল?

ভজন একটু থেমে বলে—ভালোবাসা কি পাপ বাবাঠাকুর? ওই কচি মেয়েটাকে ওরা যেন গলা টিপে মারতে চায়। ঝিগিরি করাবে। ওর জীবনটার কি কোন দাম নাই গ? ওই তরঙ্গের কথা বলছি। এই নিয়েই বুড়ো ঘোষমশায় শাপ-শাপন্ত করলেক আমাকে, ওই মদনা গায়ে হাত তুলেছে, আর কিশোরী বলে আমি চোর। কিন্তু তুমি বেরাহ্মণ, দেবতা। তোমাকেই বলি—পাপ করিনি। তরঙ্গকে বিয়ে

করতে চেয়েছিলাম বাবাঠাউর। আর তরঙ্গও— সেটাতে মত দিয়েছিল। তাই এত কাণ্ড।

ভজন চুপ করল। কি যেন ভাবছে। ওর মনের পটে তরঙ্গের সেই কান্নাভেজা মুখখানা মনে পড়ে বারবার। তাকে সে নিয়ে আসতে পারেনি, ফেলে রেখে এসেছে ওই অমানুষগুলোর মধ্যে ওই অপমান আর যন্ত্রণার রাজ্যে।

গজানন চুপ করে ছেলেটার কথা শুনছে। সেও দেখেছিল ওদের মেলামেশা আর এই নিয়ে যে এতবড় কাণ্ডটা ঘটতে পারে তা ভাবেনি।

গজাননের মনে হয় তরঙ্গের মত মেয়ে কেন সব হারিয়ে ওইভাবে থাকবে? ভজনও ভালো ছেলে, তরঙ্গ ওকে নিয়ে সুখী হবে।

কিন্তু ভাবনাগুলোর কোন সমাধানই হয় না। গজানন সিঙ্গাড়ার জন্য আলু সেদ্ধ করেছিল, সেগুলোর খোসা ছাড়াতে ছাড়াতে বলে চিন্তিতমনে,

—কিন্তু দিনকাল, সমাজ এসব তো আছেরে?

ভজন চাইল ওর দিকে। দূরে ডাঙ্গায় এর মধ্যে কারখানার কাজ শুরু হচ্ছে। পাথুরে টিলাগুলোর বুকে ডিনামাইট বসিয়ে প্রচণ্ড বিস্ফোরণে সেগুলোকে চূর্ণবিচূর্ণ করে চলেছে। ওখান থেকে সেই শব্দটা ভেসে আসে। ভজন বলে,

—ওইসব কোনদিন হয়েছিল এখানে? মাটি-পাহাড় ফাটিয়ে নোতুন কারখানা বিজলী কল, এসব হয়েছিল? একালে হচ্ছে। তবে আর ওই মিথ্যে বেড়া আর ভাবনাগুলোই বা থাকছে কোথায় গ? মানুষের দরকারে পৃথিবী পাহাড় যদি ধ্বসে পড়তে পারে, তবে ওই পচা নিয়মগুলোই বা দুঃখ বাড়াতে কেন থাকবে বাবাঠাউর? কবে বিয়ে হয়েছিল আর মরে গেছে কবে ছেলেটা, তরঙ্গ আজীবন তাই নিয়ে জ্বলেপুড়ে মরবে?

গজাননও একথাটা ভাবে। একটা কালো ঝড়ো মেঘ যে পলাশপুরের শান্ত আকাশে ঘনিয়ে আসছে এইটা সেও বুঝেছে। রূপ

বদলাবে পলাশপুরের। ভিতর বাইরে এর অনেক ভাঙ্গনই ঘটতে চলেছে। গজানন জবাব দিল না। গভীরভাবে কথাটা ভাবছে। একথার জবাব তার জানা নেই।

প্রমথবাবু সকালের ট্রেন পাস্ করিয়ে হিসাবপত্র চুকিয়ে এইবার যাবে বাসার দিকে। তখন পরেশবাবুর কথাটা মনে পড়ে। ওই লোকটার সঙ্গে ওর অনেক দিনের পরিচয়। বন্ধুত্ব ও রয়েছে। একই সঙ্গে পড়তো তারা। পরেশ ছেলেবেলা থেকেই বেপরোয়া। পাশ করে কোথায় কি কারবারের চেষ্টায় উধাও হয়েছিল। প্রমথ তারপর রেলের চাকরী নিয়ে এখান-ওখান ঘুরে পলাশপুরে এসেছিল। হঠাৎ দেখা হয়ে যায় ক'বছর আগে ওর সঙ্গে।

পরেশ কাঠের কারবার করে বনে, লগ-জ্বালানী কাঠপত্র ট্রাকে না হয় ওই স্টেশন থেকে ওয়াগনে চালান দেয়। আর বনে পাহাড়ে থেকে থেকে কেমন বুনো হয়ে গেছে পরেশ। এন্তার মদ খায়—ধেনো, মহুয়াতেও অরুচি নেই পরেশের।

প্রমথ তখন বিয়ে করেনি, একাই থাকে। সন্ধ্যার ট্রেনে নেমে রাতটা এখানে কাটিয়ে যেতো পরেশ বনের দিকে। রাতভোর মদ গিলতো—আর নিজেই যোগাড় করে আনতো মুরগী। তাই ঝলসে নিতো। অবশ্য প্রমথকেও ভাগ দিতো।

রাত্রি গহনে এই জনহীন নির্জন প্রান্তরে দুটো আদিম মানুষ যেন হারিয়ে গেছে। প্রমথের কাছে এই বিচিত্র অভিজ্ঞতা কেমন ভয়েরই বোধ হতো। পরেশ হাসতো ওর পুতুপুতু ভাব দেখে।

—ব্যাটা যুধিষ্ঠির। গেল! মদ গিলবি এত পুতু পুতু কেন রে?

চুরি করে ভীতু লোভী প্রমথ এই উদ্দাম জীবনটাকে যেন লুকিয়ে অনুভব করতে চাইতো। কিন্তু পরেশের মত দুঃসাহসী বেপরোয়া সে নয়। তাই নিজেকে অপরাধীই মনে হতো নেশা কেটে গেলে। সামলাবার চেষ্টা করতো প্রমথ—এসব ভালো নয় পরেশ।

পরেশ বলে—এই ভণ্ডামি রাখ প্রমথ। তোর শ্লা মেয়েদের দিকে লোভ নেই? মাল খেতে ভালো লাগে না? তবে ওই ভণ্ডামি কেন? এসব ভালো নয়? ন্যাকামি। আমি বাবা হিপোক্রিট নই। বনে পাহাড়ে থাকি—ইট্ ড্রিঙ্ক এণ্ড বি মেরি। ব্যস্।

—বিয়ে-থা কর, ঘর-সংসার পাত! প্রমথ উপদেশ দেবার ভঙ্গীতে কথা বলতো।

প্রমথের কথায় পরেশ জবাব দেয়।

—তুই কি করছিস?

—ভাবছি বিয়ে থা করবো। এভাবে দিন কাটে না।

প্রমথ যেন একটা প্রয়োজনই বোধ করে সংসার পাতার। পরেশ কথাটা ভাবছে। ওর মাথায় নানা ভাবনা। তাই যেন মদের ঘোরে ওসব কিছু ভাবনার হাত থেকে মুক্তি পেতে চায়।

রাত্রি নামে। পরেশ হঠাৎ যেন ওই অন্ধকার তারাকিনী আকাশের দিকে চেয়ে কিসের সন্ধান করে। জীবনের কোন উজ্জ্বল তারার আলোটাকে সে হারিয়ে ফেলেছে। আজ তার সারা মনে শুধু অতলান্ত অন্ধকারই। পরেশ হঠাৎ যেন বদলে গেছে। বলে ওঠে পরেশ।

—বিয়ে-থা করে লাভ কি? বেশ তো আছি! তাছাড়া ওটার তো অভাব নেই!

পরেশ এতকাল পর আজও বদলায় নি। অনেকদিন পর পরেশ আজ এখানে এসেছে ওই ডোমরীকে দেখে বলে পরেশ।

—এটা কোত্থেকে এল রে?···নোতুন আমদানী বুঝি!

প্রমথ ওকে থামাবার চেষ্টা করে।

দুপুরে বাড়ি থেকে সে আর পরেশ এসেছে ইস্টিশান ঘরে। মাল চালানের কাগজপত্র করাতে হবে। বুকিং-এর টাকাকড়ি মিটিয়ে আজই বৈকালে যেতে হবে পরেশকে আসানসোলে। পরেশ বলে।

—নিজে তো বৌ পেয়েছিস এবার।

পরেশ বাইরে ওই মেয়েটাকে দেখে চাইল। প্রমথ বাধা দেয় তাকে। পরেশকে ষ্টেশনের ঘরে সরিয়ে এনে বলে—

বোস ! কিযা-তা বলছিস ? বৌ-এর সামনে ফট্ করে বিয়ারের বোতল খুলে গিললি ! আবার এখানে ওর দিকে নজর দিচ্ছিস। একটা কাণ্ড বাধাবি দেখছি তুই।

পরেশ বলে—ব্যাটা ভণ্ড কোথাকার ? বৌ-এর কাছে প্রেস্টিজ চলে গেল, না ? আরে, বউরাও ওই মিন্ মিন্ স্বামীকে থোড়াই কেয়ার করে। একটু পৌরুষ দেখাবি—দেখবি ভালোবাসবে !

আপ ট্রেনে উঠে পরেশ চলে গেল।

পরেশ চলে যেতে প্রমথ একটু নিশ্চিন্ত বোধ করে।

···ঘটনাগুলো সামান্যই, অকারণ। তবু প্রমথের মনে হয় বকুলের কথা। ও যেন অনেক সংযত আর নিজেকে কোথায় একটা সীমা-প্রাচীরের আড়ালে সরিয়ে রেখেছে। প্রমথ চেয়েছিল বকুল কি উষ্ণতায় তার সারা মন ভরিয়ে দেবে। কিন্তু সেখানে ব্যর্থ হয়েছে প্রমথ। কোথায় একটা প্রশ্ন জাগে প্রমথের মনে।

তরঙ্গের ব্যাপার জানে বকুল। আজ রূপসীই খবরটা দিয়েছিল। আর বকুলও জানলা থেকে দেখেছিল ভজনকে। রূপসী বলে। —ছোঁড়াটা কাজ-কাম ছেড়ে বাউরা হয়ে পথে পথে ঘুরছে, মেয়েটারও দেখা নাই আজ। হোল কি গো ওদের ?

···বকুলের মনে পড়ে তরঙ্গের কথাগুলো। একটা কঠিন প্রাচীরের সামনে এসে যেন পথ হারিয়ে গেছে তাদের।

বকুলের মনে হয় তরঙ্গের বঞ্চিত জীবনের সঙ্গে তার ব্যর্থ জীবনের কোথায় একটা নিবিড় মিল রয়ে গেছে।

সেও অনেক হারিয়েছে। ঠকে গেছে, আর জীবনভোর সেই বঞ্চনার ব্যাথা তাকেও বইতে হবে মুখ বুজে।

বকুলও এই বনবাসে বন্দী হয়ে গেছে, নিজের সব অস্তিত্বকে ভুলে

ওই প্রমথের নীরব বুভুক্ষার সামনে নিজেকে তুলে ধরার সব ভাণই করতে হবে বকুলকে। এ যেন তার নিঃশেষ অপমৃত্যু।

…তাই এই ক্ষণিক দূরের জগতে হারিয়ে যেতে চায় সে। নিখিলও এসেছে। ওর বদ্ধ জীবনে ওই মেয়েটি এনেছে মুক্তির আশ্বাস। বকুলও যেন তার পথ চেয়ে থাকে।

বকুল নিখিলকেই বলেছে আজ তরঙ্গের কথাটা।

নিখিলও দেখেছিল ওদের। নিখিল তাই সহজভাবেই বলে,

—মেয়েটাকে বিয়ে-থা করুক ভজন! দোষ কি?

বকুল চা করে এনেছে। ওর চোখেমুখে হাল্কা হাসির ধারা। নিখিলের সামনে ক'দিনেই অনেকখানি সহজ হতে পেরেছে সে। ওরা প্রায় সমবয়সীই। আর দু'জনের মনের নির্জন নিঃসঙ্গতা ওদের অজানতেই পরস্পরকে অনেক কাছে এনে ফেলেছে। নিখিলের হাতে চায়ের পেয়ালা দিয়ে বকুল নিজের কাপটা নিয়ে একটা মোড়া টেনে ওর কাছেই বসেছে।

নিখিলের ওই সহজ সমাধানের কথায় বকুল দু'চোখের তারায় ঝিলিক এনে বলে,

—এক কথায় মিটে গেল, ব্যস্। তা মশায় বিয়ে করা কি এতই সোজা? মেয়েটার বাবা, ভাই, সমাজ আছে, তাছাড়া একবার বিয়ে হয়েছিল মেয়েটার, বিধবা। তার আবার বিয়ে হবে?

নিখিল বলে—ওসব বিয়ের আবার কি মানে থাকতে পারে? ছটো মন্তর পড়লেই হয়ে গেল?

—বাঃ, খুব তো সাহস তোমার? বকুল হাসছে খিল-খিলিয়ে। বলে ওঠে বকুল—তাহলে অন্যের বিয়ে করা বউকে দেখছি তুমি বিয়ে করে আনতে এতটুকু অমত করবে না? ডাকাত কোথাকার!

প্রমথ বাড়িতে ঢুকছিল, হঠাৎ ওদের বাঁধভাঙ্গা হাসি আর ওই কথাগুলো শুনে থমকে দাঁড়ালো। বকুলের কথাগুলো তার মনে কি দুঃসহ জ্বালা এনেছে।

ক'দিন ধরেই দেখেছে প্রমথ বকুলের ওকে এইভাবে এড়িয়ে যাবার ভাবটা। আর তাই যেন কাছে টেনে নিয়েছে নিখিলকে। ভূষণ ড্রাইভারও সেদিন এমনি একটা মন্তব্য করেছিল, আজ সব মিলিয়ে প্রমথের মনে হয় কোথায় একটা গোলমাল ঘটে গেছে। প্রমথ ঢুকতে গিয়ে বাইরে থমকে দাঁড়ালো, কান পেতে থাকে সে।

নিখিল বকুল ওরা কেউই জানে না যে একজোড়া চোখ তাদের দিকে আড়াল থেকে কি জ্বালাভরা চাহনি নিয়ে চেয়ে আছে। লক্ষ্য করছে ওদের সহজ এই আলাপটুকুকে। নিখিল চায়ে চুমুক দিয়ে বলে,—ওসব মিথ্যা কুসংস্কার আমি মানি না। ভালোবাসাটাই বড় কথা। দুটো মন্তরের চেয়ে তার দাবী অনেক বেশী।

বকুল হাল্‌কাস্বরে শুধোয়—তেমন কিছু ঘটেছে নাকি?

নিখিল জানায়—ঘটেনি। তবে ঘটলে সেটা ফেস্‌ করতে পারবো।

বকুল বলে—খুব বেড়ে উঠেছো দেখছি। নাও রেওয়াজ করতে বসো। যত্তো সব আজে বাজে কথা তোমার।

নিখিল জানায়—না, না, সত্যি কথাই বলছি। মনের মিল ভালোবাসা যেখানে নেই, সেখানে ওই নিছক অনুষ্ঠানের বাঁধনটাই বড় নয়।

প্রমথ চুপে চুপে সরে এল। সারা শরীরের রক্ত ওর মাথায় উঠেছে। বেশ বুঝেছে নিখিলও যেন বেপরোয়া হয়ে উঠতে চায়, আর প্রমথও বিশ্বাস করতে পারে না বকুলের মনকে। প্রমথ বেশ ভাবনায় পড়েছে। সরে এল সে বাইরের দিকে।

রোদের তাতে লাল কাঁকুরে মাটি তেতে উঠেছে, দূর দিগন্তে লি-লি করে তাম্রাভ প্রান্তর, দূরে পাহাড় টিলায় বিস্ফোরণ চলেছে, নোতুন কারখানার পত্তন হবে। ধূলো উড়ছে দুদিকে। গরমও বেশ পড়েছে।

প্রমথ ঘেমে উঠেছে এইটুকু পথ আসতে, স্টেশনের ওপাশের ঘন গাছগাছালির আড়ালে ডোমরী আর নসুকে দেখে থমকে দাঁড়ালো।

ডোমরীর কালো নিটোল দেহে যেন জোয়ার এসেছে। কাপড়-চোপড় এলোমেলো—নস্তুর উন্মত্ত বাহু-বন্ধনে নিজেকে সঁপে দিয়ে বিবশ মেয়েটা হাসছে খিল-খিলিয়ে ছায়া ঘন একটা গাছের আড়ালে।

প্রমথ দৃশ্যটা দেখে চমকে ওঠে। মনে হয় ওই স্বৈরিণী ডোমরী উন্মাদ নস্তু, ওই নিখিল আর বকুল—ওরা যেন বিধাতার হাতে একই ছাঁচে তৈরী কোন পুতুল। বাইরের খোলস আর রূপটাই বদলেছে, মনের দিক থেকে ওরা সবাই এক বাঁধনে বাঁধা। সমাজের সব বাঁধন—ন্যায় নীতিকে ফাঁকি দিয়ে নিজেরা হয়তো চুরি করে অনেক কিছু পেতে চায়। আর সেই সামান্য পাওয়াই তাদের কাছে অনেক বড়।

প্রমথ অপিসে ঢুকে কি ভাবছে। তারও করার কিছু আছে। এখানের অফিসের সেই-ই মালিক। কিছুদিন ধরে দেখছে নিখিলের কাজগুলো সারা হয়নি। কে জানে রাতের বেলায় কি করে সে। আজ ওর এই কাজের গাফিলতিটাই প্রমথের কাছে অসহ্য হয়ে উঠেছে। সদর অফিসে তারই ব্যাপারে আজ রিপোর্টখানা লিখতে বসে। ওই নিখিলের স্বপ্নরাজ্য সে ছারখার করে দেবে। অবশ্য প্রমথ চতুর লোক। এ নিয়ে কোন কথাই বলবে না। দেখে যাবে ওদের এই লীলাটুকু! তারপর! চরম আঘাত দেবে।

মালগাড়ি নিয়ে ইঞ্জিনটা ঢুকছে। তারপরই ভূষণ রায়-এর গায়ের ঘামে ভেজা মবিল-লাগা জামাটার গন্ধ এখানে ওঠে। পানজারানো দাঁত বের করে ভূষণ চেয়ার টেনে বসে শুধোয়।

—কি এত ইংরেজী লিখছো দাদা?

প্রমথ নিখিলের বাকী পড়া কাজের বিরাট ফিরিস্তি দিয়ে বেশ কড়া করে রিপোর্টখানা শেষ করে এবার তৃপ্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে বলে—আর বল কেন? কত কি ষ্টেটমেণ্ট পাঠাতে হয়।

ভূষণ ওসবে কান দেয় না। যুৎকরে বসে শুধোয় সে—

বৌদি ভালো আছে তো? তা গানটান চলছে ভালোই? বলছিলাম দাদা—ডিভিশন্যাল রেলওয়ে ইনস্টিটিউটের ফাংশানে বৌদিকে

একটু গাইতে হবে। মানে ব্যাপারটা বোঝো না? এখানে পড়ে থাকবে কেন? ধরে করে ভালো জায়গায় বদলি নিয়ে যাও! এ্যাঁ—কথায় বলে স্ত্রী ভাগ্যে ধন। তা না হোক একটু পজিশন তো করতে পারো।

প্রমথ বলে—দেখা যাক।

ওরা আজ প্রমথকে মনে মনে হিংসা করে, আর বকুলই তার শান্ত জীবনে এই সমস্যাগুলি এনেছে। প্রমথ এবার বিপদেই পড়বে ওর জন্য।

প্রমথ বলে—দেখা যাক। হ্যাঁ ডিভিশনে যাচ্ছো, অপিসে জরুরী চিঠিখানা দিয়ে দিও ভাই। লগবুকে এনট্রি করে দিলাম।

—ঠিক আছে। ভূষণ রায় মাথা নাড়ে। তার কাজ হয়ে গেছে। আজ সাইডিং-এর ব্যাপার নেই। তাই তাড়াতাড়ি ফিরতে পারবে সে। ভূষণ বের হয়ে ইঞ্জিনে গিয়ে উঠল।

প্রমথ আজ আর বেরুল না। দেখা যায় ডোমরী চলে যাচ্ছে বাসার দিকে। নন্তুর পাত্তা নেই তখনও। এ যেন একটা বিচিত্র জগতের ভিড়ে হারিয়ে গেছে সে। লু চলতে শুরু হয়েছে। প্রমথ বাসায় ফেরে।

বকুলকে দেখছে প্রমথ। এ যেন অন্য একজন। কয়েকদিনের মধ্যেই সংসারের সব ভার তুলে নিয়েছে বকুল। তরিতরকারী—মাছ—ডাল আর আমের টক রেঁধেছে। বকুল বলে চলেছে।

—অনেক আমের আচার দোব। কিছু গুড় আনিয়ে দাও না সহর থেকে। আর ডালদা ফুরিয়ে গেছে। কই! ভাত ভাঙ্গো—মাছটা কেমন হয়েছে? টাটকা মাছ পেয়ে বেশী করে রাঁধলাম।

প্রমথ চুপ করে খেয়ে চলেছে। ওর কথায় মাথা নাড়ে মাত্র। বকুল বলে—নিখিলের জন্যও কিছুটা মাছ পাঠালাম।

প্রমথের চোখে ভেসে ওঠে বকুলের সেই হাসি-উচ্ছল সহজ সুন্দর রূপটা। কেমন রহস্যময়ী ঠেকে। পরেশের কথা মনে পড়ে প্রমথের।

ও বলে সবাই আমরা ভণ্ড। ভণ্ডামির মুখোস পরে নিজের প্রকৃত রূপটাকে ঢেকে রাখি। আর ঠকাই অন্যকে।

বকুল যেন তেমনি ছলনাময়ীই। প্রমথকে ঠকাতে চায় সে।

বকুল বলে—আজ দুধ নেই! তরঙ্গ আসেনি। বেচারার বাবার খুব অসুখ। ওর কপালও পুড়েছে সবদিক থেকেই। ভাবছি মেয়েটার খবর নিতে যাবো একবার।

প্রমথ ওর কথাগুলো শুনছে। বকুলের মনে যেন তরঙ্গ আর ভজনের ব্যাপারটা গভীর ভাবে রেখাপাত করেছে।

বকুলের দিকে চাইল প্রমথ। ওঁই খবর নিতে যাওয়ার কথা শুনে মনে মনে একটু মজা বোধ করে প্রমথ। বলে—বেশ তো! ঘোষমশায়ও তুমি গেলে খুশী হবে।

—তুমিও চলো না? বকুল গাঢ়স্বরে অনুরোধ করে। প্রমথ একটু অবাক হয়। মনে মনে সে ভেবেছে এও তার একটা অভিনয়ই! প্রমথ তাতে ধরা না দিয়ে বলে।

—তখন তো দুটো ট্রেণের কাজ, বরং নিখিলকে নিয়ে যাও। সন্ধ্যার আগেই ফিরবে। ঝড়-জলের দিন—এখানের কালবৈশাখীর মাতন আলাদা। ফিরতে দেরী করো না।

প্রমথ কথাগুলো বলে বকুলের দিকে চাইল। দেখছে ওর মুখে খুশীর নীরব ভাবটুকু। প্রমথ ওদের সবদিক থেকে চরম আঘাত হানার ক্ষেত্র তৈরী করছে সুকৌশলে।

বৈকালটা অনেক শান্ত আর সুন্দর। নদী পার হয়ে পলাশ বনের সরু পথ ধরে তারা চলেছে। বকুল আর নিখিল। বনোয়ারী ঘোষ ভাবতে পারেনি যে প্রমথবাবুর নোতুন বৌ আসবে তাকে দেখতে।

বকুল এগিয়ে যায় ওর দিকে। বৃদ্ধ উঠে বসেছে—আসুন মা। কত ভাগ্যি আমার।

বৌ-রাও এসেছে। ওদিকে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে তরঙ্গ। ওর

মুখচোখে নীরব বেদনার ছায়া। একটি কথাও বলেনি সে। বকুল বলে,—রোজ যায় তরঙ্গ। আজ গেল না, শুনলাম আপনার খুব অসুখ!

বনোয়ারীর চোখ দুটো জলে ভরে ওঠে—আর শরীরের দোষ কি মা। অনেক সয়েছে, এবার জবাব দিলে বলার কিছু নেই। তবে দুঃখ হয় মেয়েটার জন্যে! এতবড় সংসারে ওর আপন কেউ থাকবে না।

বকুল চাইল তরঙ্গের দিকে। কি যেন বলতে চায় বকুল। হয়তো লোকটাকে বোঝাতে চেষ্টা করবে। কিন্তু তরঙ্গের নীরব ইশারায় সেকথা তুললো না বকুল।

বৈকাল গড়িয়ে সন্ধ্যা নামছে। তরঙ্গ ওদের এগিয়ে দিতে আসছে। ছায়া আঁধার নেমেছে পথে। তখনও রোদ-পোড়া মাটির বুক থেকে তাপ উঠছে। বকুল বলে—তরঙ্গ এ কি করলি তুই? ভজন চলে গেল, তুই রয়ে গেলি?

তরঙ্গ বলে—আমাকে বেরুতে না করেছে দাদা। ছোটদা ভজনকে মারধোরও করেছে। আমার গায়েও হাত তুলেছিল—

তরঙ্গের কথা গুলো বেদনায় ব্যাকুল হয়ে ওঠে।

—আর চুপ করে সব সইবি? বকুলের কথায় প্রতিবাদের সুর ফুটে ওঠে। তরঙ্গের মনের জ্বালা নামছে চোখের জল হয়ে।

দুটি মেয়ে আজ যেন তাদের জীবনের সব অবিচার আর বঞ্চনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ব্যর্থ চেষ্টা করছে।

বকুল ও কথাটা ভেবেছে। তার মনের প্রতিবাদই যেন মুখর হয়ে ওঠে।

বকুল বলে—এভাবে তিলে তিলে মরার থেকে ভজনের সঙ্গেই চলে যা। ছেলেটাকেও দেখলাম আজও তোর খোঁজেই ওদিকে গেছল। ভজনকে দেখলে দুঃখ হয়।

নদীর কাছাকাছি এসে গেছে তারা। এখন কদম দহের বুকে জল

তেমন নেই। পাশেই বিশাল কদম গাছটা উঠে গেছে ঘন সবুজ পাতার স্তূপ নিয়ে। তরঙ্গ দাঁড়ালো।

নিখিল এগিয়ে চলেছে, বকুল বলে—যাবি একদিন।

তরঙ্গও ওখানে যেতে চায়, কি যেন মুক্তির আশ্বাস আছে বাইরে। ঘরের বাঁধন এই বন্দীদশার সামিলই হয়ে উঠেছে। তাই বলে তরঙ্গ—দেখি! যাবো বই কি।

বকুল এগিয়ে চলে। হঠাৎ ওদিক থেকে কাকে বের হতে দেখে চাইল। এখান থেকে জায়গাটাকে ভালো করে দেখা যায় না। তবু নিখিল আর বকুল দাঁড়িয়েছে গাছের ওপাশে।

ভজনই এসেছিল বৈকালে ওই নদীর ধারে, জানে তরঙ্গ হয়তো আসবে, তারই আশায় বসেছিল। তরঙ্গ ওকে এখানে দেখে চমকে ওঠে। মনের বেদনার গভীরে জ্বালা ফুটে ওঠে। তরঙ্গ এগিয়ে এল—তুমি!

ভজন ক্রমশঃ যেন মনকে তৈরী করেছে। ভজন বলে,

হ্যাঁ। তোর জন্যেই এসেছিলাম।

তরঙ্গ তীক্ষ্ণ স্বরে বলে—আর এসো না। না। কত-বার বলেছি আমাকে শান্তিতে বাঁচতে দাও। তবু তুমি শুনবে না? এমনি করে জ্বালাতন করলে মরা ছাড়া আর পথ থাকবে না আমার। মরতেই হবে।

তরঙ্গের তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর আর্তনাদের মত শোনায়। ভজন বিবর্ণ মুখে ওর দিকে চেয়ে থাকে।

তরঙ্গ কথাগুলো বলে ফিরে চলে গেছে গ্রামের দিকে।

বকুল চাইল নিখিলের দিকে। ওর দু'চোখে নীরব যন্ত্রণার ছায়া। নিখিল বলে—মেয়েটা যেন নিজেকে শেষ করেই তৃপ্তি পেতে চায়। তবু প্রতিবাদ করবে না।

বকুল ওর দিকে চাইল। তারও মনে হয় ব্যর্থ জীবনের বোঝাই বইতে হবে তাকে জীবনভোর। সেই হাহাকারের খবর ওরা কেউ জানবে না। বকুল বলে,

—মেয়েদের অনেক সইতে হয় নিখিল। জীবনের সব বঞ্চনাকেই তাদের মুখ বুঁজে মেনে নিতে হয় রক্তাক্ত মন নিয়ে। তবু করার কিছুই নেই।

নিখিল চমকে ওঠে। বকুলের চোখে সেই বেদনার গভীরতা ফুটে ওঠে। আর চারিদিকে বাতাসে ওঠে নদীর ঝিরঝির শব্দ, ঝরাপাতার মর্মর। শেষ দিনের আলোর রং মুছে বিবর্ণতা নামছে। বকুলের দিকে চাইল নিখিল ও দেখেছে বকুলের জীবনের একটা শূন্যতাকে। নিখিল বলে জীবনে তুমিও ঠকেছো।

বকুল আজ যেন ভেঙ্গে পড়তে চায়। তবু পারে না। বিষণ্ণ সুরে বলে,

—সেই হিসাব করে লাভ কি নিখিল? সব বঞ্চনাকেই মেনে নিতে হবে। প্রতিবাদ করতে পারলাম কই?

সেই আলো-আঁধারিতে কাকে নোতুন করে দেখে নিখিল। বলে ওঠে,

—জীবনের এত বড় বঞ্চনাকে মেনে নিতে হবে?

নিখিল বুঝেছে বকুলের মনের হাহাকারটাকে। প্রমথবাবুর মত একটা লোককে বকুল চিরকালের জন্য মেনে নিতে পারে না। ত্ব'জনের মনের দিক থেকে কোথাও মিল নেই। রুচিরও।

এই ডোমরীর ব্যাপারটাও তার কাছে রহস্যময় ঠেকে। পরেশবাবু আর প্রমথের রাতের সেই উন্মাদনাময় মুহূর্তগুলোকেও দেখেছে নিখিল। আর ক্রমশঃ জেনেছে বকুলের মনের নীরব শূন্যতাকে। আজ নিখিল যেন সোচ্চার হয়ে উঠতে চায়। বকুল দেখছে নিখিলের চোখ মুখে সেই সমবেদনাটুকুকেও।

বকুল হাসল মাত্র। বিষণ্ণ মলিন হাসি। বলে ওঠে বকুল।

—পথ কি বলো? তরঙ্গকেও তাই তো কোন পথের নিশানা দিতে পারিনি। পথ যে আমিই জানি না।

নদীতে নেমেছে ওরা। তির তির জলে বকুলের পায়ের ফর্সা পাতাটা ডুবানো, যেন একটা পদ্মফুল ভেসে ভেসে চলেছে। পায়ে আলতা পরেছিল, জলে সেটা ধুয়ে ধুয়ে যায়। হঠাৎ খেয়াল হয় একটা

গুরু গুরু গর্জন, চমকে ওঠে বকুল। নদীর জলে কালো মেঘের ছায়া পড়েছে।

—ইস্। মেঘ জমেছে।

সারা আকাশ ছেয়ে মেঘগুলো জমে উঠেছে পাহাড় বন-এর মাথায়। হঠাৎ কালো মেঘটা লাল হয়ে ওঠে, দূরাগত বাতাসে ওঠে শোঁ শোঁ গর্জন। সারা বন পাহাড় কাঁপিয়ে একপাল দৈত্য যেন হানা দিয়েছে অতর্কিতে।

নদীর বালিয়াড়ি থেকে বালিগুলো বকুলের নরম গালে দেহে এসে বিঁধছে। বাতাসের বেগে দাঁড়ানো যায় না—ছিটকে ফেলে দেবে। নিখিল ওর হাত ধরে টেনে নিয়ে দৌড়চ্ছে, চোখ চাওয়া যায় না। বাতাসে উড়ছে বকুলের শাড়ির আঁচল—এলোমেলো চুল। উদ্ধত দেহের রেখাগুলো ওই ঝড়ের মাতনে কি মুক্তির দুঃসহ আনন্দে যেন মেতে উঠেছে। দু'জনে ছুটছে ওই ঝড়ের মাঝে।

ছিটকে পড়ছিল বকুল, নিখিল ওকে ধরে ফেলেছে। উচু লাইন থেকে নইলে ছিটকে পড়তো খাদের ভিতর। বৃষ্টি নেমেছে, অঝোরে বৃষ্টি। বকুল চমকে ওঠে নিখিলের ওই নিবিড় স্পর্শে—উত্তপ্ত নিঃশ্বাসে। বৃষ্টির ধারাস্নান ওর দেহের সব বাঁধন ভেঙ্গে যেন সোচ্চার করে তুলেছে।

বকুল হাঁপাচ্ছে। নিখিলেরও চমক ভাঙ্গে। বিদ্যুতের ঝিলিকে দুটি আদিম নারীপুরুষ যেন ক্ষণিকের জন্য নিজেদের মনের অতলের চিরন্তন বুভুক্ষাকে প্রত্যক্ষ করে শিউরে উঠেছে। বকুল নিখিলের নিবিড় বাঁধন থেকে মুক্ত করে নেয় নিজেকে। ওর সারা দেহে মনে কি মাতন চলেছে। আবার বৃষ্টির হিমস্পর্শে কি তৃপ্তি পায় বকুল। নিখিল দেখছে বিচিত্র এক নারীকে।

বকুল সলজ্জভাবে বলল—ভিজে নেয়ে উঠলাম যে। চলো—

ঠাণ্ডা পড়েছে, দুজনে প্লাটফর্মে এসে উঠেছে কোনরকমে। তখনও সমানে বৃষ্টি চলেছে। লোকজন যাত্রীও নেই। প্রমথ ইষ্টিশান ঘরে

বসে হিসাবপত্র দেখছিল। মনে মনে আজ খুশী হয়েছে সে। চুপ করে ওদের দেখছে।

ওদের দু'জনকে ওই অবস্থায় দেখে প্রমথ বলে—ইস্ ভিজে নেয়ে গেছো যে।

নিখিল হাসল। বকুল দেখছে লোকটাকে। প্রমথবাবু শান্ত কণ্ঠে বলে—বৈকালের ট্রেনেই অর্ডারটা এসেছে নিখিল। জরুরী অর্ডার। সই করে নাও।

বকুল বের হতে গিয়ে থামলো। নিখিল খামখানা সই করে ওই অবস্থায় খুলে পড়ছে। একটু অবাক হয় সে।

—বদলির অর্ডার দাদা! নিখিল আর্তকণ্ঠে বলে ওঠে।

বকুল দেখছে নিখিলকে আর ওই প্রমথকে। কোথায় অন্ধকার দিগন্ত কাঁপিয়ে একটা বাজ পড়লো। ধ্বনি-প্রতিধ্বনি তোলে সেই গর্জন—কাঁচের সার্সিগুলো ঝনঝনিয়ে ওঠে। বকুলের ভয় হয়—নিষ্ঠুর একটা দৈত্য যেন অমনি কি দুর্বার আঘাতে তার সব কিছুকে চুরমার করে দিতে চায়। নিখিলও ভাবতে পারেনি যে এমনি কিছু ঘটবে।

প্রমথ স্থির কণ্ঠে বলে—বিলিভিং চাকরীর ওই তো জ্বালা হে। কোথাও বেশ গুছিয়ে বসলে, ব্যাস অমনি হুকুম—জয়েন অমুক ষ্টেশন। কাল সকালেই হেড কোয়ার্টারে যাচ্ছো তাহলে? আজ রাত ডিউটি করো—কাল সকালের গাড়িতে রিলিভিং ক্লার্ক এলে চার্জ হ্যাণ্ড ওভার করে দিও।

প্রমথের খেয়াল হয়। নিখিলকে সাবধান করে দরদী কণ্ঠে।

—যাও ভিজে কাপড়ে থেকো না, ঠাণ্ডা লাগবে।

অর্থাৎ ওদের এখান থেকে সরিয়ে দিতে চায়। প্রমথ যে ওদের অন্তরালের কিছু কাহিনী জানে সেটা বুঝতে দিতেও চায় না। তাই দরদভরা স্বরে ওদের মঙ্গল চিন্তা করেই কথাগুলো বলেছে প্রমথবাবু। ওরা চলে যেতে প্রমথ আজ হাসছে তৃপ্তিভরে।

রূপসী এই ভয়ই করেছিল। নম্বুকে শোধরাতে পারেনি। সন্ধ্যার মুখে আজও উধাও হয়েছে সে। আর খোয়াড়ের দুটো বড় মুর্গীকেও পাওয়া যাচ্ছে না। বৃষ্টির মধ্যে রূপসী খুঁজছে মুর্গী দুটোকে। অন্ধকারে তার ডাক ভেসে ওঠে—আয়—আয়! তি তি!

কিন্তু তাদের কোন পাত্তাই নেই। লোকটাও গায়েব হয়ে গেছে। রূপসীর সারা মনে এই অবহেলা আর নম্বুর এই আঘাতটা কি সাড়া এনেছে। তার বুনো রক্তে মাতন জাগে। মুখ বুঁজে এতবড় অনাচার সে সইবে না। জানে ওই ডোমরীর ওখানেই গেছে লোকটা। দরকার হলে ওই মরদটাকে আর মেয়েটাকেই চরম আঘাত দেবে সে।

রূপসী বকুলকে দেখে চাইল। পিছনে আসছে নিখিল। বকুলের মনে একটা নীরব প্রতিবাদের কাঠিন্য, নিখিল চুপ করে গেছে। তার এখানের এই পর্ব এবার পরিণত হবে শুধু একটু ক্ষীণ স্মৃতিতে। বকুলের মনে হয় তাকেই অপমান করেছে প্রমথ।

রূপসী ওদের দু'জনকে দেখে চাইল মাত্র। তার মনের জ্বালার পটে বকুল নিখিলের এই অভিসারটাও বিরক্তিকর বলেই বোধ হয়।

বাবু ষ্টেশনে দিনরাত খাটছে, আর বউটা উড়ে বেড়াচ্ছে। ওরা যেন ডোমরীর মতই, চারিদিকে ওদের অনেক পাবার নেশা। রূপসী আজ সেই লোভটারই জবাব দিতে চায়। ওই বৃষ্টির মধ্যে এগিয়ে চলেছে রূপসী জ্বালাভরা মন নিয়ে নম্বুর খোঁজে।

বকুলের চোখের সামনে রাত্রির এক নিষ্ঠুর রূপ ফুটে ওঠে। এতদিন স্বাধীনভাবে চলেছিল আজ মনে হয় তার সেই স্বাধীন ইচ্ছায় বাধা দেবার অধিকার একজন ছিনিয়ে নিয়েছে। নিখিলের এই বদলির ব্যাপারে প্রমথই মূল কারণ। আর এটা সেই করিয়েছে, যেন প্রমথ বকুলকে জানিয়েছে যে তার ভুলও প্রমথ ক্ষমা করবে না।

রাত হয়ে গেছে। একটা মালগাড়ী ক্লান্ত চাকার তীব্র শব্দ তুলে

বের হয়ে গেল অন্ধকারে। ওর জীবনটাও যেন এমনি অন্ধকার ফুঁড়ে চলেছে লক্ষ্যহীন কোন অনিশ্চিত গতিপথে। তরঙ্গের কথা মনে পড়ে। ওরা সবাই এমনি অন্ধকারে হারিয়ে গেছে কি গভীর বেদনার অতলে।

হঠাৎ চাইল বকুল, প্রমথ ঘুমোয়নি। হ্যারিকেনের ম্লান আলোটা জ্বলছে, বাইরে বৃষ্টি থেমেছে, তবু দমকা বাতাসে গাছের পাতায় জমা জল ঝরে। প্রমথ বলে—ঘুম আসছে না?

ওর সন্ধানী দৃষ্টিটা বকুলের নজর এড়ায় না।

বকুল জবাব দিল না। লোকটাকে যেন সইতে পারে না আজ। ওর মনের অতলের নীচ লোভী স্বরূপটাকে চিনেছে। প্রমথ বলে ওঠে একটু ব্যঙ্গভরা স্বরে।

—খুব ব্যথা লেগেছে, না? বেচারা বদলি হয়ে গেল।

চমকে ওঠে বকুল ওর জ্বালাভরা কথার স্বরে। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাইল সে প্রমথের দিকে। অনেক সয়েছে বকুল।

সে আজ প্রশ্ন করে—কি বলতে চাও তুমি?

প্রমথ ওর দিকে চাইল। ওর চাহনিতে আজ বিজাতীয় একটা কাঠিন্য, মুখখানা থমথম করছে। প্রমথ জবাব দিল না, আজ বকুলকে দেখছে সে রাত্রির গভীবে কি অন্য দৃষ্টিতে।

বকুলের মুখখানা থমথমে, তু'চোখে কি অসহায় বেদনার কারুণ্য, নিটোল দেহখানার রেখাগুলো যেন সোচ্চার কামনাময় হয়ে উঠেছে। আজ সন্ধ্যায় দেখেছিল প্রমথ ওই যৌবনবতী নারীকে। কোন জবাব দেবার নেই। প্রমথ আজ নিষ্ঠুর পৌরুষ দিয়ে ওই বকুলের সবকিছু ছিনিয়ে নিতে চায়। চমকে ওঠে বকুল। তু'চোখে ওর নিবিড় ভয় জাগে। প্রমথের এই সর্বগ্রাসী রূপটাকে আগে দেখেনি সে।

প্রমথের উন্মাদ দেহটা ওকে যেন গ্রাস করতে চায়, নিবিড় বাঁধনে বকুলকে সে আজ বেঁধে ফেলেছে—মুক্তির কোন পথ নেই। প্রমথ আজ নিজের প্রতিষ্ঠা চায়।

ওই দানবটা আজ বকুলের জীবনে নিজের অধিকারের চিহ্নটাকে

কায়েম করতে চায়। উষ্ণ নিঃশ্বাসে কি দুঃসহ জ্বালা ফুটে ওঠে, হাঁপাচ্ছে বকুল। বাধা দেবার কোন শক্তি তার নেই। অতল অন্ধকারে কোথায় হারিয়ে গেল সে কি এক তীব্র যন্ত্রনার জগতে। সারামন ঘৃণায় ভরে উঠেছে।

প্রমথ আজ কি নোতুন মন নিয়ে জেগে উঠেছে এই রাত্রির গহনে। দুচোখে ওর অতৃপ্ত কামনার জ্বালা। তখনও আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে মেঘের গর্জন ওঠে, মাটির বুক থেকে ওঠে ভিজে ভিজে মিষ্টি গন্ধ। অন্ধকারে সেই গর্জন—ওই সুবাস কোথায় হারিয়ে গেল।

সকাল হয়েছে। মেঘমুক্ত সকাল। বিছানায় শুয়ে শুয়ে বকুল বাইরের দিকে চাইল। মনে পড়ে গতরাত্রের সেই ঘটনাটা, একটা দৈত্য কি নিষ্ঠুর আক্রমণে তার সব কিছু ছিনিয়ে নিয়েছে। প্রেম ভালোবাসা—এসব কিছুর ছোঁয়ায় মনের এ কামনার সুর রঞ্জিত হয়ে ওঠেনি। দুঃসহ অপমানই সয়েছে সে কাল। ওই লোকটা জানাতে চেয়েছিল বকুলের নিজস্ব কোন সত্ত্বা নেই। তার সত্ত্বার অপমৃত্যু ঘটেছে গতরাত্রে। হত্যাকারী ওই স্বার্থপর লোকটা।

হঠাৎ মনে হয় ট্রেণখানা আসছে। নিখিল আজ এই ট্রেণেই চলে যাচ্ছে। যাবার আগে দেখাও করেনি। প্রমথ তাকে ষ্টেশনে আটকে রেখেছে চার্জ দেবার জন্য, সব কাজ মিটিয়ে ওই ট্রেণেই চলে যাবে নিখিল। বকুলের সঙ্গে আর দেখা হবে না।

বকুল যেন একজন বন্দী, এখানে তার কোন স্বাধীন সত্ত্বা নেই। এই কঠিন সত্যটাই নীরবে জানিয়ে দিয়েছে তাকে ওই প্রমথবাবু।

রূপসী চা নিয়ে এসেছে। বকুলকে বিছানায় দেখে বলে—শুয়ে আছো যে এখনও? সকালের গাড়ি এসে গেল।

বকুল জানায়—শরীরটা ভালো নেই।

রূপসী বকুলের দিকে চাইল। রূপসীও জানে ছোটবাবুর বদলির খবর। আজই চলে যাচ্ছে নিখিলবাবু। বকুলের মন খারাপ হবার

কথাই। তবু ধূর্ত মেয়েটা চায়ের কাপ রেখে বলে ওঠে—শরীর খারাপ হবে না কেনে? রোদে জলে তো ঘুরছোই বৌদি। কাল সন্ধ্যায় কাকভেজা ভিজলে।

বকুল জবাব দিল না। রূপসী কাল রাতে নস্কে টেনে এনেছিল পথ থেকে। ডোমরীকে পায়নি। তার পিছনে তক্কে তক্কে আছে—তেমন কিছু দেখলে হাসুয়ার কোপ দিয়ে ওই মেয়েটাকে শেষ করে দেবে। রূপসী বলে,

—তা ছোটবাবু নাকি বদলি হয়ে যাচ্ছে দেখলাম। নোতুন এক বাবুও এসে গেছে। বুড়োমত লোকটা—কি করবে গো এখানে?

বকুল চুপ করে থাকে।

রূপসী বলে ওঠে—বড়বাবুকে বলে ইবার ওই ডোমরীটাকে বদলি করাতেই হবে বৌদি।

বকুলের মনে হয় রূপসী হয়তো আরও কিছু বলবে। তাই ওকে জানায়—কে এল গেল এসবে কাজ কি বাপু, যা উনুন ধরাগে। দুধ এসেছে?

রূপসী ধমক খেয়ে চুপ করে যায়। মনে মনে অবশ্য খুশী হয়েছে রূপসী। ছোটবাবু গেছে—ভালই হয়েছে। বৌদির জ্বালার কারণটিও জানে সে। কিন্তু তার সমস্যার সমাধান হয়নি। ডোমরীটাকে' হঠাতেই হবে।· দুধের কথায় বলে রূপসী,

—তরঙ্গ আসেনি। কদম দ'হে বান ডেকেছে গো। গজানন বাউন বলেছে দুধ পেলে পাঠিয়ে দেবে।

রূপসী এবার বাবুর এলেম দেখে খুশীই হয়েছে। মরদ হবে এমনি। বৌকে শাসন করতে হবে। আর বৌও হবে ঘরমুখো। ওই ছুক ছুক স্বভাবের ছেলেমেয়েগুলোকে একদম দেখতে পারে না রূপসী।

ডোমরীর কাছে এটা একটা খেলাই। মানুষগুলোর চোখে সে সাড়া জাগিয়ে আনন্দ পায়, আর তার মাংসল দেহটার দিকে ওদের

নজর আছে সেটা জেনে মনে মনে খুশী হতে চায় সে। কিন্তু ওই ভালোবাসা ঘর বাঁধার নাম নিশানা তার মনে নেই। ফেলে আসা লোকটার কথা মনে পড়ে।

ডোমরী দেখেছে রতন ফায়ারম্যানও ডিউটি সেরে রাতের গাড়িতে ফিরলে তার ঝুপড়িতে আসে। নস্যুর মত ও কে খেনো মদ গেলায় না। আর রতনের পয়সার জোর আছে। ডোমরী দেখেছে নস্যু, রতন, ইষ্টিশানের বড়বাবু, বিষেণপুরের ধনি মহাজন অবিনাশ, মায় মাষ্টারমশায়ের বন্ধু কাঠের কারবারী ওই পরেশবাবুর চোখে সেই নেশা।

ডোমরীর মনে হয় এ খেলার কোন দাম নেই। তার নিজের পুঁজি কিছুই বাড়ে নি। রাগ করে সুদামডি থেকে স্বামীকে ছেড়ে পালিয়ে এসে এখন মনটা খারাপ করে। আর এখানেও ঘেয়ো কুকুর গুলোকে দেখে সেই জ্বালাটা বেড়েছে ডোমরীর।

ডোমরী একটা বিচিত্র মানুষকে দেখেছে, সে ওই গজানন। তত তেজ নেই রোদের। গজানন একাই ডাল ভাত ফুটিয়ে দীঘিতে স্নান সেরে খাওয়ার পাট চুকিয়ে নেয়। দোকানের ছেলেটা বাসন মেজে-টেজে ওদিকে ঘুমুচ্ছে। ডোমরীকে দেখে চাইল। ডোমরী ওর কাছেই এসেছে আজ।

গজানন বলে ওঠে—মদ মেরে দুপুরে ঢলানি করতে আইছিস? যা দিকি।

ডোমরী বসল একটা বেঞ্চে। ওর চোখেমুখে উচ্ছলতা। স্নান সেরে ফর্সা শাড়িখানা পরেছে, চোখে কাজলের রেখা, সারা দেহে ওর মাদকতা।

ডোমরী বলে—তুমি কি গো ঠাকুর! এলাম—দুদণ্ড মনের কথা কইতে, তা খেদাই দিছ গ।

গজানন বলে ওঠে—টিকে ধরাবার জমিন নাই—আবার রসের কথা কইতে হবে আমাকে। কেন নস্যু—ওই রতন ফায়ারম্যান কোথায়

গেল রে? তোর বড় খদ্দেরকেও দেখছিলাম সেদিন, ওই পরেশবাবু? সেখানে যা বাপু, ক্ষ্যামা দে দিকি।

ডোমরী চাইল লোকটার দিকে। ওর চোখে কি বিষণ্ণতা আর ক্লান্তির ছায়া। দেখেছে মেয়েটা পুরুষের চোখের শুধু নেশাটাকেই। ডোমরী আজ ক্লান্ত পরাজিত।

ডোমরী বলে—ওগুলোন মানুষ! জানোয়ার। মনে হয় ইখানে এসে ভুলই করেছি।

—তবে ওদের নাচাস্ কেনে? গজানন ধমকে ওঠে।

মেয়েটা জবাব দিল না। জানে সে ওই লোকগুলো তাকে জ্বালাতন করে। কিন্তু দোষ হয় ডোমরীরই।

ডোমরী বলে—দোষটা আমারই দেখবা গ। আমিও মানুষ বা-ঠাউর। কলসী ভরে কিছু তো পেতে চাই গ! তা যে ঘাটেই গেছি দেখছি জলে শুধু পোকা, থিক থিকে পোকা। তেষ্টাও মিটল না কলসীও শূন্যি রয়ে গেল বাঠাউর। সে দুঃখুটো কেউ জানলো নাই।

গজানন অবাক হয়ে মেয়েটার দিকে চেয়ে থাকে। ওই রঙ্গিনী স্বৈরিণী মেয়েটার মনের অতলের এই দুঃসহ যন্ত্রণা আর শূণ্যতার খবর কেউ জানে না।

বুকভরা শূণ্য নিঃস্ব পৃথিবী, একদিনের বরিষণে তার বুকজোড়া রুক্ষতা কোথাও স্নিগ্ধ সবুজ দাক্ষিণ্যে ভরে ওঠেনি।

ডোমরী বলে—ঘেন্না ধরে গেছে বাঠাউর। মনে লয় লোকটার কাছে সুদামডিতেই ফিরে যাই, তা মাষ্টারবাবুতো তোমাকে ভালোবাসে—একটুন বলে দাও না বদলির কথাটা। সুদামডিতে বদলি করে দেক আমাকে।

বাবু নেখলেই হয়ে যাবেক, রতনই বলেছে—বাবুর কলমের জোর আছে গ, এক রিপোর্টে রাতারাতি ওই ছোটবাবুকে বদলি করে দিলেক এখান থেকে সটাদ কোতুলপুর ইষ্টিশনে।

কথাটা গজানন ও জানে আর ব্যাপারটা সে ও দেখেছে। হয়তো

বকুলের সঙ্গে মেশামেশি করতো, দু'জনে একবয়সী। প্রমথবাবুর সঙ্গে বকুলের বয়সের ফারাক অনেক বেশী। তাই বড়বাবু কৌশলে ছেলেটাকে এখান থেকে সরিয়ে দিল। গজাননও নিখিলের চলে যাওয়াটায় দুঃখ পেয়েছে।

নিখিলবাবুর বদলির মূলে যে ওই প্রমথবাবু সেটা বুঝতে পেরেছে গজানন। নিখিলবাবু বেশ হাসিখুশী সুন্দর একটি তরুণ। গজাননের ভালো লাগত ওকে। তার নিঃসঙ্গ জীবনে নিখিল ছিল সঙ্গী। ডোমরীর কথায় গজানন বলে—দেখি। জানাবো কথাটা।

ডোমরী বলে একটু তাই দেখ।

দুপুরে ঘুম আসেনি বকুলের। প্রমথ ঘুমুচ্ছে, ওই লোকটার নির্জন সান্নিধ্যটুকু এড়াতে চায় বকুল। গতরাত্রে দেখেছে ওর হিংস্র আদিম একটা রূপকে, নিখিলকে সরিয়ে দিয়েছে প্রমথই, আর বিজয়ীর উল্লাসে কাল তাই নিষ্ঠুর আক্রমণে তাকে বিপর্যস্ত করেছিল।

বকুলের মনে রয়েছে একটা অপমানের জ্বালা। বকুল দুপুরে বের হয়ে এসেছিল ছায়াঢাকা নির্জন বাগানে, ওই দোকানেও লোকজন নেই। পায়ে পায়ে গজাননের এখানে এসে ওই স্বৈরিণী মেয়েটাকে দেখে দাঁড়িয়েছিল। এখানের মেয়ে-পুরুষগুলোর মনের আদিম রিপুগুলোকে যেন চিনেছে সে। গজানন-এর মত লোকও তাদের সঙ্গে স্বতন্ত্র নয় হয়তো। বকুল ওদিকে দাঁড়িয়ে কানপেতে শুনছে কথাগুলো।

কিন্তু ডোমরীর কথাগুলো শুনে অবাক হয়। মেয়েটার মনের অতলে নীরব একটা হাহাকারকে সে দেখেছে। আজ সেও আসে গজাননের কাছে তার মুক্তির জন্য। বকুল শুনেছে নিখিলকে সরাবার কাহিনীটা।

প্রমথ, ওই মোটা টাঁকওয়ালা লোকটা তাকে ঘৃণা করে, সন্দেহ করেছে। বকুলকেও প্রমথ ভেবেছিল ওই ডোমরীর সমগোত্রীয়া, তাই নিখিলকে কৌশলে সরিয়ে দিয়ে তাকে ভোগ করতে চায়।

অধিকার করতে চায় তার দেহটাকে। বকুলকে মুখ বুজে সেই অপমানটা মেনে নিতে হয়েছে।

গজানন আর ডোমরী বকুলকে দেখেনি। ওদের দেখার পর বকুল ওখানে যায়নি, বাড়ির বাইরের গাছতলায় সে ফিরে এসেছে।

গজানন বিড়িতে টান দিয়ে শুনছে ডোমরীর কথাগুলো।

বলে সে—চলে যাবি এখান থেকে ?

ডোমরী বলে ওঠে—তোমার মন কেমন করবে নাকি গ ? যদি হিয়েয় ঠাঁই দাও থাকতে পারি।

গজানন হেসে ওঠে—মুখপুড়ির সখ কতো ? বেরো—দুপুরে এল ভাবনা দেখাতে।

ডোমরী হাসছে—নাঃ ইখানে হেরে গেছি গ ! তা কথাটা বাবুকে বলবা কিন্তু। ইখানে শিয়াল শকুনির জ্বালায় অতিষ্ঠ হয়ে গেলাম। ই খেলা আর ভালো লাগে না গ।

মেয়েটা চলে গেল।

ডোমরীর মনের অতলের নীরব হাহাকারটাকে দেখেছে, দেখেছে তরঙ্গের বুকভরা হতাশা, বকুল এই নির্জন দুপুরে নিজেও সেই বেদনার সমভাগী হয়ে উঠেছে। পাতার আড়ালে একটা কোকিল ডাকছে—কোথায় দূর থেকে তীক্ষ্ম স্বরে আর একটা কোকিল সাড়া দিয়ে চলেছে। বকুল বোঁটা-খসা আমগুলোকে দেখেও কুড়োতে ছোটে না আজ।

দুপুর গড়িয়ে বৈকাল নামছে। সেই মুর্গী চুরির পর থেকে নন্তুও সাবধান হয়ে গেছে। রূপসী ঠিক করতে পারেনি, বোধ হয় মুর্গীটাকে শিয়ালে নিয়ে গেছে এমন যায় মাঝে মাঝে। কিন্তু নন্তুও বসে নেই। মাঝে মাঝে ওর মনে একটা ঝড় জাগে ডোমরীকে কেন্দ্র করে।

সেদিন রাতের অন্ধকারে নন্তু বাইরে গিয়ে অন্ধকারে চড়াই-এর নীচের ঝুপড়িটার দিকে এগোলো। জোনাক-জ্বলা রাত্রি, দূরে বাঁকের মাথায় সিগন্যালের আলোটা জ্বলছে। এখন রোজই মেঘ

ঝড় সুরু হয়েছে। তবে আজকের ঝড়ের সেই উদ্দামতা নেই। বৃষ্টি পড়ছে ঝিমঝিম সুরে।

ডোমরীর ঘুম আসেনি। হঠাৎ দরজায় কার পায়ের শব্দ শুনে চাইল। রতন ফ্লায়ারম্যানকে কালই বলেছিল ডোমরী—আর আসবা নাই তুমি ইখানে।

রতন বলে—কেনে রে? কি দোষ করলাম?

ডোমরী গর্জে ওঠে—তুমার কেনা মাগ লই হে! বলছি, আসবা নাই। এলে ভালো হবেক নাই।

রতন-এর লম্বাটে মুখখানায় শয়তানির হাসি ফুটে ওঠে—কেনে? আর কেউ জুটলো বুঝি? তা কতো দিবেক তোকে?

ডোমরী ফুঁসিয়ে ওঠে—সে খোঁজে তোমার দরকার কি? তুমি আসবা নাই।

ডোমরী বৃষ্টির রাতে পায়ের শব্দ পেয়ে ভাবে বেহায়া লোকটা বোধ হয় আবার এসেছে। ডোমরীও মনে মনে ক্ষেপে উঠেছে। নস্কুকেও পাত্তা দেয়নি—ক'দিন থেকে সন্ধ্যা বেলাতে ও বের হয় না। গজাননের দোকানেই কাজ করার ভান করে আটকে থাকে ডোমরী।

গজানন বুঝতে পেরে বলে—ব্যাপাব কি রে তোর? ঘরে যাবি না?

ডোমরীর দুচোখ জলে ভরে ওঠে, বলে সে,

—ওই নরকের গন্ধ আর ভালো লাগে না বাঠাউর। দাও না বাবুকে বলে বদলি করে।

গজানন ওর কথায় একটু অবাক হয়। কদিন ধরেই ডোমরী ওই কথা বলছে। কি ভেবে গজানন ইষ্টিশানের ঘরের দিকে এগিয়ে যায়।

সন্ধ্যার পর প্রমথ একা বসে কাজ করছিল, গজাননকে দেখে চাইল

—কি ব্যাপার?

গজানন বলে ওঠে—ডোমরীর কথাটা বলেছিলাম, রোজই তাগাদা দিচ্ছে মেয়েটা। দ্যান না বাবু ওর বদলির একটু ব্যবস্থা করে।

আজও গজানন বলেছে কথাটা প্রমথবাবুকে। প্রমথবাবুও অবাক হয় গজাননকে আজও ওই কথা জানাতে।

—মেয়েটা চলে যাবে?

গজানন জানায়—সুদামডি ইষ্টিশানে যেতে চায়। ওর স্বামীও নাকি ওখানের কোন কোলিয়ারীতে কাজ করে।

প্রমথবাবু হাসে—উর্ব্বশীর ঘর বাঁধার সখ! দেখি।

গজানন জবাব দিল না। চুপকরে দোকানে ফিরে এসে বলে গজানন—বাবুকে বলেছি। বাবু বললেন হয়ে যাবে।

ডোমরীও স্বপ্ন দেখে নোতুন করে বাঁচার। ওসব পথ তাই ছেড়ে দিয়েছে সে। রাতের অন্ধকারে হঠাৎ দরজায় শব্দটা ওঠে। ডোমরী আজ ক্ষেপে উঠেছে। ওই জানোয়ারগুলোর হাত থেকে তার মুক্তির কোন আশ্বাস নেই। দরজাটা খুলে আজ মেয়েটা রুখে দাঁড়িয়েছে। ওই আপদগুলোকে ডোমরীও উচিত শিক্ষা দেবে।

ডোমরী দরজার সামনে নসুকে দেখে বলে—তুই।

নসু মদ গিলে টোর হয়ে এসেছে। আজ ক'দিন দেখছে মেয়েটা তাকে এড়িয়ে গেছে, আর নসুও জেনেছে ডোমরীর নোতুন নাগর জুটেছে ওই রতন ফায়ারম্যান। রাতের মালগাড়ির কোন ইঞ্জিনে চলে আসে, রাত কাটিয়ে ভোরের দিকে আপ মালগাড়িতে ফিরে যায়। তার জন্যেই মেয়েটাও তার উপর বিগড়ে গেছে।

নসু বলে—কেনে চিনতে লারছিস নাকি? চল—ভেতরে চল।

—না! মেয়েটা রুখে দাঁড়ায়—চলে যা তুই?

নসুর মাথায় রক্ত চড়ে ওঠে। গর্জায় সে—শ্লা তোর লাগরের দফা আজ শেষ করে যাবো। পথ ছাড়। ভেতরে কোন্ ব্যাটা আছে হে? রতনা? শ্লা রতনা ফায়ারম্যান।

ডোমরী ওর দিকে চাইল। জানায় সে—ভেতরে কেউ নাই! তুমি ঘরে যাও। যাও বলছি ইখান থেকে।

—ধ্যাৎ। নস্থ মেয়েটাকে জোর করে ঠেলে সরিয়ে ভিতরে ঢুকতে যাবে, ডোমরী বাধা দেওয়ার চেষ্টা করতে ওকে এক ধাক্কা মেরে ছিটকে ফেলে দিতে নস্থ গর্জায়—সতীপনা!

মাতাল লোকটা এগিয়ে এসে দু'হাত দিয়ে ওকে জড়িয়ে ধরেছে, দম বন্ধ হয়ে আসে ডোমরীর। সারা দেহে ওর দুঃসহ একটা যন্ত্রণা। বুনো মেয়েটা আজ প্রতিবাদের জ্বালায় কি কাঠিন্য নিয়ে জ্বলে ওঠে। ছাড়াবার পথ নেই—একটা পাথরের টুকরো হাতে ঠেকে ডোমরীর, সেইটা তুলে নিয়েই অন্ধকারে নস্থর মাথায় সজোরে আঘাত করে। প্রচণ্ড আঘাতে নস্থর হাতের বাঁধন আলগা হয়ে আসে। ডোমরী বুঝতে পারে ওর হাতে ভিজে ভিজে রক্তের উষ্ণ ছোঁয়া, লোকটা ছটফট করছে। বাঘিনীর মত এক ঝটকায় নিজেকে মুক্ত করে নিয়ে মেয়েটা তখনও কি উন্মাদের মত পাথর দিয়ে এলোপাথাড়ি আঘাত করে চলেছে। অন্ধকার আকাশ ফাটিয়ে বৃষ্টির ধারা নেমেছে, গুরু গুরু মেঘ ডাকে। ডোমরীর মাথায় যেন খুন চেপেছে। আজ সে প্রতিবাদে কঠিন নির্মম হয়ে উঠেছে।

—এত নীচ তুমি! বকুলের নীরবতা আজ সোচ্চার হয়ে উঠেছে। প্রমথ দেখছে ওকে। রাতের অন্ধকারে সে আজ অন্য মানুষ। নির্জন প্রান্তর কাঁপিয়ে ঝড়ো হাওয়ায় মেশে মেঘের মত্ত গর্জন। প্রমথও আজ বকুলকে শাসায়।

প্রমথ বলে ওঠে—পিরীত! পিরীত ছুটিয়ে দোব।

—বাজে কথা বলো না। বকুল প্রতিবাদ করে—কি দেখেছো তুমি? অনর্থক একটা ভালো ছেলেকে যা-তা অপবাদ দিয়ে তাড়াতে বিবেকে এতটুকু বাঁধেনি? এত নীচ ভাবতে পারলে আমাকে! ছিঃ ছিঃ।

বকুলের দু'চোখে ঘৃণা। প্রমথ তীক্ষ্ণস্বরে শোনায়।

—ও সতীপনার দাম কি জানি? থাক! আর শুনে রাখো, মুখ বুজে থাকবে এখানে। বেচাল দেখলে সইবো না।

বকুলের সারা মনে তীব্র জ্বালা ওঠে, লোকটার ওই দাবীদার

সাজার প্রতিবাদে বলে ওঠে বকুল—তোমার কেনা বাঁদী নাকি? যা বলবে তাই মেনে নিতে হবে মুখবুজে।

প্রমথ দেখছে বকুলকে। একটা উদ্ধত বিজলীর রেখার মত যেন ঝকঝক করছে মেয়েটা। ওর দেহের রেখাগুলো উদ্ধত, উত্তেজনার আবেগে শাড়িটা সরে গেছে, ধারালো নরম মুখে চোখের ওই জেগে ওঠা কাঠিন্যটুকু কি সাড়া আনে প্রমথের মনে।

প্রমথের মনে পড়ে কথাটা। ওর বাবা নাকি দু' হাজার টাকা চেয়েছিল—আর সেটাও যোগাতে হয়েছিল প্রমথকে, নইলে প্রমথ ওই পরেশের সঙ্গে কাঠের ব্যবসায় আরও টাকা ঢালতে পারতো। আরও বেশী লাভ আসতো। আর আখেরে এই চাকরীরও দরকার হতো না। ব্যবসাতেই নামতে পারতো। জানে পরেশের ওই ব্যবসায় মন নেই—ওকে একটু হাতে রাখতে পারলে প্রমথই সব ব্যবসাটা পুরো দখল করতে পারবে।

কিন্তু নগদ টাকাটাও দিতে হয়েছিল বকুলের বাবাকে তার সেই দূর সম্পর্কের দিদির মারফৎ, প্রমথের বিয়ের নেশায় হাজার পাঁচেক টাকাই জলে গেছে। আর, সমস্যাগুলো বেড়েছে মাত্র ওই বকুলকে ঘরে এনে।

প্রমথ কথাটা যতই ভেবেছে ততই জ্বলে উঠেছে। বকুলের ওই অবাধ্যতায় আর কঠিন প্রতিবাদে প্রমথ আরও ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে।

বিয়ে ভালোবাসা এসবের জন্য কোন দাম নেই প্রমথের কাছে। দখলদারী করার আনন্দটাই তার কাছে বেশী বড়। বকুল তার টাকা দিয়ে কেনা সম্পত্তি। তাতে দখল একা প্রমথেরই।

প্রমথ তাই বকুলের প্রতিবাদে আজ ক্ষেপে উঠেছে। কঠিন স্বরে জানায় প্রমথ

—যদি তাই বলি?

বকুল ওর মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে। লোকটার কথায় অবাক হয় সে—মানে? আমি কি কেনা বাঁদী!

প্রমথ জানায় স্থির কণ্ঠে—তোমাকে কেনার জন্য নগদ দু'হাজার

টাকা তোমার বাবাকে দিতে হয়েছে অন্য খরচা ছাড়াও। আর তোমার বাবা সেই টাকার বদলে তোমায় বিক্রী করেছে।

—টাকা দিয়ে কিনেছো আমায়? দাম ওই কয়েক হাজার টাকা। বকুল বিশ্বাস করতে পারে না এতবড় অপমানজনক কথা।

তাই আর্তনাদ করে ওঠে। ওই বিয়ে—ভালোবাসা—স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক কোনকিছুই মানে না লোভী লোকটা। ওর কাছে তার আর কোনো মূল্য নেই। দাম মাত্র ওই-ই!

বকুল কি নিদারুণ আঘাত আর অপমানে বিবর্ণ হয়ে ওঠে। প্রমথ হাসছে। নিষ্ঠুর একটা মানুষ বিজয়ীর মত আজ অসহায় মেয়েটাকে দখল করতে চায়। বকুল তার সব ব্যক্তিত্ব তেজ যেন হারিয়ে ফেলছে।

রাতের নির্জন অন্ধকারে দমকা বাতাসে ঝরে পড়ে পাতার জল, জলকণা, কি হাহাকার ওঠে আকাশে-বাতাসে। পলাশ আঁটাড়ি ঝোপের আড়ালে দুটো নীল হিংস্র চোখ জ্বলছে, ছটফট শব্দ ওঠে। একটা বুনো খরগোসের উপর লাফিয়ে পড়েছে শিয়ালটা, ধারালো থাবা আর দাঁত দিয়ে ওর বুক-গলা ফেড়ে ফেলে তাজা উষ্ণ রক্তটা চুষছে, অন্ধকারে ওর লালসাভরা দু'চোখ জ্বলছে।

পরাজিত বিধ্বস্ত বকুলের আজ দুঃসহ গ্লানিময় এই জীবনে সব প্রতিবাদও হারিয়ে গেছে। দু'চোখ বয়ে জল নামে—আকাশ ছেয়ে বৃষ্টি নেমেছে রাতের অন্ধকারে।

ভোরবেলায় রূপসীর চীৎকারে শান্ত জায়গাটা ভরে ওঠে। কাল রাতে ওই কস্‌বি মেয়েটা নাকি নসুকে আধমরা করে দিয়েছে। নসুর মাথা ফাটিয়ে দিয়েছে ডোমরী।

বকুল খবরটা শুনে চমকে ওঠে। কাল দুপুরেও ওই ডোমরীর কথা শুনেছিল, মেয়েটা ওই শিয়াল-কুকুরের হাত থেকে বাঁচতে চায়, আর অন্য কোন পথ না পেয়ে এই পথই নিয়েছে ডোমরী। একটা লোভী পুরুষকে চরম আঘাত করেছে।

সকালেই ডোমরীকেও নিয়ে এসেছে কোয়ার্টারে, মেয়েটার মুখেচোখে কাঠিন্য, রূপসী গর্জাচ্ছে—ডাইনী কোথাকার। মুখে নুড়ো জ্বেলে দোব। খুন করবি তুই ?

প্রমথ দেখছে মেয়েটাকে। এখানের সেই-ই এখন মুখ্য প্রশাসক। নন্তুর কপালে মাথায় ব্যাণ্ডেজ বাঁধা, রূপসী গর্জাচ্ছে। ডোমরী নির্বাক। প্রমথ বলে—এমনি করে মারবি ? কি করেছিল লোকটা ?

ডোমরী বলে—জানোয়ার উটো।

প্রমথ জানে সব কথা। তাই বলে।

—তুইও খুব সতী, না ?

রূপসী সমানে গর্জাচ্ছে। নন্তুর কথা বলার উপায় নেই। প্রমথ বলে—কি এমন করেছিল ও।

বকুল দেখছে ডোমরীকে। বকুলের চোখে ভেসে ওঠে গত রাত্রের ওই প্রমথের মত্ততার ছবিটা। অমনি পশুর মত লালসা নিয়ে লোকটা তার উপর চরম আক্রমণ করেছিল, কোন প্রতিবাদ করতে পারে নি বকুল। মুখ বুঁজে বুকফাটা চাপা কান্নায় সব অপমান সয়েছে। আর ওই বুনো মেয়েটা তেমনি আর একটি জানোয়ারের আক্রমণের প্রতিবাদ করেছে কঠিন আরণ্যক রীতিতে।

ডোমরী গর্জে ওঠে প্রমথর কথায়—লুকটাকেই শুধাও তুমি !

রূপসী চীৎকার করে—ত্যাজ। এত ত্যাজ কিসের লা ?

নন্তু বলে ওঠে—চুপ দে রূপসী !

রূপসী তবু থামে না। ওর কাঠফাটা গলায় খন্ খন্ বাদ্যি বাজে।

—সতীপনা ! লুকের ঘরে আগুন জ্বালিয়ে মরদগুলানকে নাচিয়ে এখন সতীপনা ! ঠ্যাকার ঝেড়ে দুব তোর ঝাঁটার বাড়িতে।

ডোমরী জবাব দিল না। ডিউটির সময় হয়ে গেছে তাই চলে গেল। প্রমথকেও ইস্টিশনে যেতে হবে, ট্রেণের সময় হয়ে আসছে। প্রমথ তাই বলে।

—পরে দেখছি। নন্তু আজ কাজে যাসনে, গোপাল ডাক্তারের

কাছে যা, ওষুধপত্র নিয়ে আয়। হারামজাদা—একটা মেয়েছেলের হাতে এমনি মার খেয়ে এলি ?

রূপসী গর্জায়—ওটা মরদ ! মেয়েছ্যালারও অধম। অমন মেনি-মুখো মরদের মুয়ে আগুন দিই ! চল—যাবি আর ? যেমন কুকুর তেমনি মুগুর। আমি যদি হতাম—ছুঁড়িকে শ্যাস করে আসতাম।

রূপসীর হঠাৎ পৌরুষ জেগে গেছে এই আঘাতে।

হঠাৎ হাল্কা হাসির শব্দ ওঠে। ধারালো গলায় কে শোনায় সামনে এসে রূপসীকে।

—তা তুমি মরদেরও বাপ গ ! ইবার থেকে শাড়িটা কাছা দিই পরে মরদের মতই থাকবা। ইখান ওখানে খাবলা মেরে বেড়াবে।

বকুল অবাক হয়—তুই ! এখনও বেঁচে আছিস মুখপুড়ি ? কতদিন আসিস নি।

তরঙ্গ এসেছে দুধ দিতে বেশ কিছুদিন পর। তরঙ্গ হাল্‌কা স্বরে বলে।

—মরতে যে ডর লাগে গ ! তাই বেঁচেই রইছি।

তা চা-ফা হবেক, না রূপসী মাসীর পাঁচালিই শুনবো বিয়েনবেলা থেকে। বকুলই আমন্ত্রণ জানায়—বোস্।

প্রমথ স্টেশনের দিকে এগিয়ে যায়। নসু চলেছে। রূপসী ধমক দেয় নসুকে বেশ কড়া স্বরে।

—সোজা ডাক্তারের কাছে যাবি, নালে কাল ডোমরী ঠেঙ্গিয়েছে, আজ আমি বাকীটুকু পুষিয়ে ঠ্যাং খোঁড়া করে ফেলে রাখবো। মরদ !

রূপসী গলা নামিয়ে বলে—বস লা। চা চাপাই। ঠাণ্ডা মাথায় কিছু করতে দিবেক ওরা ?

চা-পর্ব চুকিয়ে রূপসী গেছে প্লাটফর্মে তরকারি মাছের সন্ধানে।

···তরঙ্গকে দেখছে বকুল।

তরঙ্গ বলে ওঠে—এত শরীর খারাপ লাগছে কেনে গো বৌদি ?

ওর কথায় একটু হাল্কা সুর ফুটে ওঠে। বকুল বলে—

খুব যে খুশী দেখছি রে ?

তরঙ্গ হাল্কা স্বরে বলে,—দুঃখ করে লাভ কি গ?

বকুল শুধোয়—ভজনের সঙ্গে দেখা হয়?

বকুলের কথায় তরঙ্গ চুপ করে যায়।

ওইটা তার জীবনের পরম বেদনার ঠাঁই। বকুল সেখানেই তাকে ছুঁয়েছে। তরঙ্গের ডাগর চোখে টলটল আভাস জাগে। তরঙ্গ তবু ব্যাপারটাকে হাল্‌কা করতে চায়।

মেয়েটা সামলে নিয়ে বলে—সে তো ঘুর ঘুর করছে গো। আমিও বলেছি চাষ-বাস কর, গরু-মোষ-এর দুধের কারবার বড় হোক। তখন বিয়ে করবো।

—বিযে করবি ওকে? পারবি? বকুল খুশী হয় মেয়েটার কথায়। কি ভাবছে বকুল।

ভালোবাসার মর্যাদা সে দেখেছে ওদের মাঝেই। তার নিজের জীবনে সেই আশা-স্বপ্ন সার্থক হয়নি। দেখছে পুরুষের অত্যাচারী রূপটাকেই, আর তরঙ্গের জীবনে দেখেছে ওর দাদা-বাবার দাম্ভিক রূপ, তাদের অন্যায় শাসনের কঠোরতাকেই। তাই বকুল ওর প্রতিবাদের কথায় যেন খুশী হয়েছে মনে মনে।

তরঙ্গের চোখে কি স্বপ্ন। পাখীডাকা শান্ত পরিবেশে মেয়েটি যেন কোন দূর ভবিষ্যতে হারিয়ে গেছে। প্রজাপতির রং বাহার জাগে—পাখীডাকা মাদার ফুলের গন্ধমাখা স্নিগ্ধ ধরিত্রীর বুকে তরঙ্গ তার ঘর বেঁধেছে। সে আর ভজন। তরঙ্গ বলে,

—হ্যাঁ বৌদি। এভাবে সব হারিয়ে আমি কষ্ট সইবো না। ভজন আর আমি ঘর বাঁধবো। কেউ না মানে—আমরা চলে যাবো কদম-দহের পারে ওই টিলা বনের ধারে, ওখানের সোলে জমি চাষ করবে ভজন, ছোট্ট ঘর বাঁধবো—নোতুন কারখানার ওদিকে নোতুন মানুষের মাটিতে থাকবো আমরা।

বকুল দেখেছে তরঙ্গকে। কেমন দিশাহারা চাহনি ওর—সেই ভবিষ্যতের পথের সন্ধান করে। ভালোবাসা—ভালোবাসার ওই স্বাদ-

টুকুকে জানে না বকুল। ওর মনে হয় সে নিঃস্ব-রিক্তই থেকে যাবে, ওই জীবনের উষর শাসন আর দাবীর কঠিন পরিবেশে। বকুলের মন তাই আজ বিদ্রোহী হয়ে ওঠে।

ষ্টেশনের প্লাটফর্মে ভজনের গানের সুর ওঠে। তরঙ্গ উৎকর্ণ হয়ে শুনছে।

ভজন এখন নিজের ভবিষ্যৎ গড়ার চেষ্টাই করছে। জানে তরঙ্গ আসবে তার জীবনে। তাই চাষ-বাস, নিজের দুধের ব্যবসা নিয়ে পড়েছে। বনোয়ারী ঘোষ—কিশোরীর ব্যবসাকে সে টেক্কা দেবার জন্য উঠে-পড়ে লেগেছে কি নোতুন উদ্যম নিয়ে।

তরঙ্গ চলেছে বিষেণপুরে দুধের যোগান দিতে। ভজনও দেখছে তাকে। ওই মেয়েটাই তার মনে আজ হাহাকার নয়—কি সার্থকতার স্বপ্ন এনেছে। বড় হবার স্বপ্ন। মদনের সেই প্রহার, কিশোরীর চোর অপবাদ এর সব জবাব দেবে সে। চোরের মত নয়—বলিষ্ঠতা দিয়ে সে জয় করে আনবে তরঙ্গকে।

সকালের ট্রেনে ভজন মাল পাঠিয়ে ফিরছে গ্রামের দিকে নির্জন পথ ধরে।

তরঙ্গের মুখে হাল্কা মিষ্টি হাসির আভাস জাগে। ভজন বলে,—গঞ্জের দুধ যোগানের সব ঘাঁটিই দখল করে নোব দেখিস?

তরঙ্গ দেখছে ওকে। টাকা কিছু তরঙ্গই দিয়েছে ওকে। ভজন নিতে চায়নি কিন্তু তরঙ্গই বলে—তোমার একার ব্যবসা নয়—আমারও। আমার ভাগ থাকবে না?

ভজন আর প্রতিবাদ করেনি। নিজের টাকাও ঢেলেছে। তার কঠিন পণ ওই বনোয়ারীর দর্প সে চূর্ণ করবে। কিশোরীকেও জবাব দেবে—আর জয় করে আনবে তরঙ্গকে।

তরঙ্গের ভালো লাগে এই নীরব উত্তাপটুকু, বেঁচে থাকার—স্বপ্ন

নিয়ে দিন কাটানোর উষ্ণতাটুকু। এ যেন তার কাছে নোতুন করে বাঁচার আশ্বাস এই স্বপ্নটুকুকে সত্যে পরিণত করবে তারা।

তরঙ্গ চলে গেল বিষণপুরের দিকে বাকী দুধের রোজ সেরে ডাক্তারের কাছে ওষুধ নিয়ে বাড়ি ফিরবে।

নম্বুর আজ কাজ করার অবস্থা নেই।

সকালের ট্রেণে লোকজন যাত্রী মালপত্র অনেক বেশী হয়। মাল বুক করাতে হয়। প্রমথবাবু বিপদে পড়ে। পয়েন্টস্‌ম্যান রামু ও লাইনের কাজে ব্যস্ত। মালগাড়ি যাতায়াত করছে, পয়েণ্ট দিতে হচ্ছে।

নম্বু ডাক্তারের কাছে যাবার পথে তবু ষ্টেশনে এসে এক-আধটু হাত লাগাচ্ছে। হঠাৎ দেখা যায় রূপসীকে।

পাইকের—ফড়েরা কলরব করে।

—আজ মালপত্র কি বুক্ হবে না?

বেগুনওয়ালা একজন চাষী শোনায়।

—শেষকালে চেকারে ধরবে যে গো? ও বাবু মশায় মালটা বুক করান!

হঠাৎ রূপসী এসে ওই বিশাল ঝাঁকাটা তুলে কাঁটায় চাপিয়ে বলে নম্বুকে—ওজন দ্যাখ তুই—ও বাবু দ্যাখেন।

রূপসীকে গাছ কোমর করে মালপত্র তুলতে দেখে পটল বায়েন বলে—আজ তুই খালাসী হই গেলি নাকি রে?

রূপসীও দেখেছে ডোমরীকে। মেয়েটা ওপাশের প্ল্যাটফর্ম ঝাঁট দিতে দিতে ব্যাপারটা দেখছে। রূপসী শোনায়—না তো কি বাবুদের পেয়ারের নোক হয়ে প্ল্যাটফর্মে আলতো করে ঝাঁটা বোলাবো গতর নাচিয়ে? মরণ। কইরে আন তোর তরকারীর ঝুড়ি।

রূপসী আজ একাই সব সামাল দিয়ে দেয়, আর সেই সঙ্গে কথারও তুবড়ী ছুটছে। নম্বুর আজ বকশিষের দিকে লোভ নেই। সন্ধ্যা-বেলার রং এর আসর আর জমবে না তা বুঝে ওটা যোগাড় করার ব্যাপারে মন দেয় নি।

অবশ্য সেটা পুষিয়ে নিয়েছে রূপসী।

মালপত্র বুক করিয়ে সব ব্যবস্থাই করেছে সে। ট্রেনখানা দেখা যায় পলাশবনের ওদিকে।

রূপসী এবার তার সংগৃহীত তরকারী—মাছ নিয়ে বাসার দিকে ফিরছে। নসুকে মনে করিয়ে দেয়—ডাক্তারের কাছে চলে যা সোজা।

নসুও গ্রামের দিকে চলেছে। আড়চোখে দেখে রূপসী, ডোমরী তখন প্ল্যাটফর্মের ছিটোনো ময়লা আবর্জনা তরকারীর খোসাপত্র পাতাগুলো সাফ করছে।

রূপসী ওর সামনে দিয়ে বের হয়ে যাবার মুখে দাঁড়ালো। ক'দিন ধরেই মেঘ করে রয়েছে। বৃষ্টিও হচ্ছে মাঝে মাঝে। আবার বৃষ্টি নেমেছে তোড়ে। থামবার নাম নেই।

রূপসী ওই বৃষ্টির মধ্যে বাসার দিকে দৌড়ল, দেরী হয়ে গেছে তার।

প্রমথ সকালের ট্রেনের প্যাসেঞ্জার বিদেয় করে এবার হিসেব নিয়ে পড়েছে। মনটা বেশ খুশীই রয়েছে। নিখিল চলে গেছে, নোতুন ছোটবাবু এসেছে, বয়স্ক ভীতু ধরণের লোক। সাতে-পাঁচে থাকে না— তাই রাত ডিউটি করে সকালে চান সেরে জলযোগের পর অফিসে কাজ নিয়ে বসে। আর মন দিয়ে সব কাজই করে যায় মুখ বুজে।

প্রমথের হাতে এখন কাজ কম। বকুলের ব্যাপারটাও সহজ করে এনেছে। এবার আগেকার সেই ব্যবসার কথাটা মাথায় চাগিয়ে ওঠে। পরেশকে হাত করার অসুবিধে নেই। কারবারটা হাতে এলে প্রমথের হাল বদলে যাবে। পরেশের মালপত্র ও কাঠের গুঁড়ির চালানও চলে গেছে। প্রমথ জানে বিনা পরিশ্রমে পরেশ কি পরিমাণ রোজগার করে, প্রমথ ওর কারবারের অংশীদার হতে পারলে বেশ কিছু পাবে, তারপর সুবিধে বুঝে সবটাই গ্রাস করে নেবে। পরেশ ফিরলে এবার কথাটা একটু আলোচনা করবে প্রমথ; হয়তো আজই ফিরবে।

প্রমথ জানতো পরেশের ফেরার খবর। কদিন দারুণ বৃষ্টি হয়েছে

বন পাহাড়ে, রাস্তাঘাটও ধুয়ে মুছে গেছে পাহাড়ী নদীর ঢলে। তাই বোধ হয় ওর ট্রাকও আসেনি ওকে নিতে। হয়তো আজ সে নাও ফিরতে পারে। তবু বিকেলের ট্রেনে পরেশ ফিরে অবাক হয়ে শুধোয়।

—ট্রাক আসেনি? কি করছে ব্যাটারা?

বৃষ্টি চলছে তখনও। প্রমথ বলে—চল ভেতরে চল।

প্রমথ গাড়ি পাস করিয়ে ওকে নিয়ে ষ্টেশনের ঘরে ঢুকে চেয়ারে বসে বলে।—যা বৃষ্টি নেমেছে ক'দিন ট্রাক আসবে কি করে? ভেসে গেছে বোধ হয়।

পরেশ ভাবছে। বলে সে—যেতে হবে ওখানে জরুরী কাজ রয়েছে।

প্রমথ বলে—পায়দল যাবি নাকি?

—ভাবছি। পরেশের এ সব অভ্যাস আছে। বনপাহাড়ে থেকে থেকে এসব বিপদকে মেনে নেয় সে।

প্রমথ বলে—চিরকালই কি এমনি ডাকাতই থাকবি? ওই বনের পথে রাতের বেলায় যেতে হবে না। কাল ট্রাক না আসে সাইডিং লাইনের গাড়িতে কোলিয়ারী অবধি গিয়ে বাকী পথটা পার হয়ে যাবি বেলাবেলি। রাতের বেলায় আজ নাই বা গেলি।

পরেশ চুপ করে সিগ্রেট টানছে। প্রমথের কথাটায় একটা আরামের আশ্বাস পায়।

শহরে গিয়ে এবার একটা নোতুন জীবনকে দেখে এসেছে পরেশ। তার মনেও একটা ভাবান্তর এসেছে।

পরেশ এতকাল সে কি জ্বালা নিয়ে বনে পাহাড়ে বাস করছিল, মনে হয়েছিল জীবনটাকে এমনি করে ছড়িয়ে ছিটিয়ে দেবে। কিন্তু ওই নির্জনতা ক্রমশঃ তার কাছে অসহ্য হয়ে ওঠে। মনে হয় নির্জন নিঃসঙ্গতাকে সহনীয় মনোরম করে নিতে পারে মানুষ তার মনের চেতনা, ব্যাপ্তি আর বোধ দিয়ে। সেটার কোনটাই তার নেই। এই মদ আর বুনো মেয়ের মত্ততা দিয়ে জীবনের সব নিঃস্বতাকে ভোলা যায় না।

পরেশ সেই কঠিন সত্যটাই বুঝেছে লোকালয়ে, মানুষের সংসারে

এসে। প্রমথকেও দেখেছে, সেই ভীরু মানুষটাও ঘর বেঁধেছে, হয়তো সুখী হয়েছে। সহরেও দেখেছে তার বন্ধু ললিত, বসন্ত সেনকে, ললিতের সুখের সংসার। ছেলেমেয়ে স্ত্রী নিয়ে ওরা শান্তিতে আছে। বসন্তের স্ত্রী মাধুরীকেও দেখেছে। কালো মিষ্টি পুতুল পুতুল একটি ঘরের বৌ, ছ'চোখে ওর স্নেহের স্নিগ্ধতা। মাধুরীই সেদিন হাসতে হাসতে পরেশকে বলে।

—ভেবেছেন অনেক পেয়ে গেছি। অবশ্যি টাকা ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স গাড়ি সবই আপনার আছে। প্রতিপত্তিও। কিন্তু মনের দিক থেকে কি পেয়েছেন—তার হিসেব করেছেন কোনদিন?

এ যেন নোতুন কথা শুনছে পরেশ।

পরেশের কাছে ওই প্রশ্নটা একটা সাড়া এনেছে। জীবনের কিছুটা দিন বিদ্রোহ করা যায়, লড়াই করা যায়। কিন্তু লড়াই শেষে ক্লান্ত সৈনিক ঘরে ফিরতে চায়, চায় স্ত্রী পরিবারের সান্নিধ্যভরা শান্ত একটি গৃহকোণ। পরেশের মনে হয় তার লড়াই-এর পর এই শান্তি নেই। সে শুধু ক্লান্ত, রক্তাক্ত। তবু মাধুরীর কথায় বলে পরেশ নিজের মনের দৈন্যটাকে ঢাকবার জন্য বলে।

—কেন? বেশ তো আছি?

মাধুরী বলে—হ্যাঁ! তাই মনের জ্বালা মেটাবার জন্য মদ গেলেন। নিজেকেই ঠকান।

পরেশ জবাব দিতে পারেনি। আজ মনে হয় অনেক হয়েছে, শহরের বাইরে বেশ খানিকটা জায়গা কিনে একটু আশ্রয় গড়বে। একজনকে নিয়ে, ঘর পাতবে। এই ব্যবসাটা গুটিয়ে ফেলতে চায়। বনপাহাড়ের নির্জন নির্বাসিত জীবন থেকে মুক্তি চায় সে।

আজ প্রমথ দেখছে পরেশকে। জানে সে পরেশের ওই অরণ্যের উদ্দাম জীবনটাকে। মদ আর বুনো মেয়েগুলোর নেশা তাকে চুম্বকের মত টানে সেখানে। তাই বলে প্রমথ,

—আরে বাবা, যাবি জঙ্গলে। একটা রাত এখানে কাটিয়ে যা
কি যে মধু আছে বনে পাহাড়ে ?

পরেশ হাসছে ওর কথায়। বলে সে,

—না রে ? ওখানের মধুতে আর রুচি নেই। ভাবছি ও
ব্যবসা এবার গুটিয়ে ফেলবো।

প্রমথ অবাক হয় কথাটা শুনে। সে যেন নোতুন একটা আশা
কথা শুনছে। পরেশের ওই ব্যবসাটার অনেক খবর রাখে সে। গেছে
মাঝে মাঝে। আর জানে কি পরিমাণ টাকা তুলেছে পরেশ ওর থেকে
প্রমথ অবাক হবার ভাণ করে—কেন রে ? কারবার তুলে দিবি ?

পরেশ বলে—ভালো লাগছে না। ভাবছি বনবাস থেকে মুক্তি
নেবো, দেখা যাক। পরেশ গভীরভাবে কথাটা ভাবছে।

প্রমথ চতুর ব্যক্তি। ওর মনের কথাটাই যেন শুনেছে সে। কি
এখুনিই এ নিয়ে কারবার ভাগাভাগি, দখল নেবার দর কষাকষি করতে
চায় না। কারণ পরেশের মত খেয়ালী, বেপরোয়া মানুষ ওর আগ্র
দেখলে এখুনিই হয়তো বেঁকে বসবে। তাই ওই ব্যাপারটা আপাতত
মুলতুবি রেখে অন্য কথা পাড়ে প্রমথ। ও প্রসঙ্গটা এড়িয়ে যা
কৌশলে চতুর লোকটা।

সন্ধ্যার আকাশে মেঘ জমেছে। প্রমথ বন্ধুকে আপ্যায়নে
আয়োজন নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। গজাননকেও ডেকে এনেছে, দোকানে
ওর মিষ্টি তেমন থাকে না মণ্ডাই সম্বল—আর তেলেভাজা। পরেশ
বাবুকে দেখে নমস্কার করে গজানন। জানে আজ রাতে খাবার বিশে
ফর্দই হবে। প্রমথ বলে—কিছু সন্দেশ করে দাও। আর ভালে
করে চপ বানাও। মাছের চপ না হয় মুরগীর ব্যবস্থাই করো।

মাথা নেড়ে গজানন বের হয়ে গেল। জানে ওরা আজ বদলে
যাবে। ওদিকে নসুর বাড়ি থেকে একটা মুরগী কেটে মাংস বানিয়ে
পাঠিয়ে দিল বাড়িতে।

মেঘ-এর মাতন শুরু হয়েছে। শেষ ট্রেণখানাও চলে গেছে। এবা

স্তব্ধতা নেমেছে সারা জায়গাটায়, মাঝে মাঝে বৃষ্টি রাতে হোড়াল-এর হিংস্র ডাক শোনা যায়, আধবাঘা নেকড়েগুলোর আস্তানা জলে ডুবে গেছে। ওরা বের হয়েছে শিকারের সন্ধানে, কালো জমাট অন্ধকারে সিগন্যালের লাল আলোটা জ্বলছে শাসনের লাল চোখ মেলে। শূণ্য মেঘকালো আকাশে ওটাই জেগে আছে মাত্র।

বকুল চেয়ে দেখছে ওদের দু'জনকে। পরেশবাবু আর প্রমথ খেতে বসেছে। প্রমথ বক বক করে চলেছে অকারণে, পরেশবাবু সে তুলনায় অনেক চুপচাপ। জানে বকুল, শেষ গাড়ি পার করে ওই মানুষ দুটো আজ মদ গিলে টোর হয়ে ফিরেছে জানোয়ারের মত। প্রমথের সব গুণগুলোই একে একে প্রকাশিত হয়েছে বকুলের সামনে।

প্রমথ বলে—পরেশকে মাংস আর একটু দাও।

পরেশই বাধা দেয়—না, না। আর লাগবে না।

—হাঁ করে দেখছো কি? কথা কানে গেল না? দাও পরেশকে? ধমকে ওঠে প্রমথ।

বকুলও বাকী মাংসটা জোর করেই পরেশবাবুর পাতে দিতে যাবে, পরেশ দেখছে ওকে। বকুলের মুখ-চোখে অপমানের ছায়াটুকু তার নজর এড়ায় নি। পরেশবাবু বলে—কি হচ্ছে প্রমথ?

প্রমথ সাড়া দিল না। একমনে খেয়ে চলেছে। গজানন এর মধ্যে টাটকা সন্দেশ এনেছে, বকুলও পায়েস তৈরী করেছে। পরেশ বলে—এসব কি করেছো এতো?

প্রমথ পরেশকে খুশী করতে চায়। তাই বকুলকেও এক ফাঁকে এসে জানিয়ে গেছে ওর যেন চেষ্টার ক্রুটি না থাকে। বকুলও জেনেছে ধূর্ত লোকটা পরেশবাবুকে খুশী করতে চায়। প্রমথের কি স্বার্থ আছে জানে না বকুল।

বকুল বলে—না না। সব ব্যবস্থাই হবে। উনি এসেছেন।

প্রমথ গজরায়—কি ছাতার জায়গা, লোককে একটু আপ্যায়ন করবে তারও উপায় নেই। অনেক দিনের বন্ধু, বহু টাকার মালিক। ঘর-সংসারও করেনি বেচারা। একটু যত্ন আত্তি করো।

বকুল বুঝেছে প্রমথের স্বার্থের গন্ধ আছে এখানে। তবু বকুল সাধ্যমত আয়োজন করেছিল।

খাওয়া-দাওয়ার পর ওপাশের ঘরে পরেশের জন্য বিছানা হয়েছে, প্রমথ আজ খুশীর চোটে একটু বেশী মাত্রায় মদ গিলে ফেলেছে। মদটা এনেছিল শহর থেকে পরেশই। আর পরেশ তত বেশী খায়নি, খেলেও নেশা তার আর হয় না। প্রমথও বিনা পয়সায় ভালো জিনিস পেয়ে একটু বেশী মাত্রায় গিলেছে।

রাত্রি নেমেছে। বকুল দেখেছে প্রমথ আজ সম্পূর্ণ বদলে গেছে। কিছু দিনের মধ্যেই লোকটার প্রকৃত স্বরূপ চিনেছে সে। একটা স্বার্থপর মানুষ। বকুলের সব কিছু জবরদখল করে ছিনিয়ে নিয়ে ওকে ক্রীতদাসীতেই পরিণত করে তৃপ্ত হতে চায়। সেই রাতের কথাগুলো ভোলেনি। টাকা দিয়ে তাকে কিনে এনেছে মাত্র, স্ত্রীর মর্যাদা অধিকার এসব প্রশ্নের কোন অবকাশ নেই ওই লোকটার কাছে। আজও পরেশবাবুর সামনে ও তাকে অপমান করেছে।

বকুলের কাছে এই অপমান যেন অসহ্য হয়ে উঠেছে। ডোমরীর কথা মনে পড়ে। তারও স্বাধীন স্বত্বা আছে—ওই নসুকে তার লালসার জবাব দিয়েছিল আদিম বন্য রীতিতে। মনে পড়ে তরঙ্গকে। ওর জীবনেও একটা স্বপ্ন আছে—সেও ভালোবাসার সার্থক স্বপ্ন দেখে। তার জন্য প্রতিবাদের কঠিন পথ ও নিয়েছে।

কিন্তু বকুল। তার সামনে সব পথ যেন অন্ধকারে ঢাকা। ওই লোকটার নিদারুণ অপমানের কোন জবাব দেবারও ভাষা তার জানা নেই। বকুলের মনে হয় চলে যাবে এখান থেকে, কিন্তু সে কথাও ভেবেছে। জানে বাবার অসহায় অবস্থার কথা। অভাবের করুণ

নগ্নতাকেও বকুল যেন ভয় করে। তাই বোধহয় পড়ে আছে এখানে সব অত্যাচার অপমান মুখ বুজে সহ্য করে।

ঘুম আসে না বকুলের। মাঝে মাঝে এসব চিন্তাগুলো তার মনের শান্তি চোখের ঘুমও কেড়ে নেয়।

অনেক বিনিদ্র রাত কেটে যায় বকুলের, চোখের জল মোছে সঙ্গোপনে এমনি রাতে।

মদ গিলে ওপাশে প্রমথ মড়ার মত পড়ে আছে। বকুল একবারও প্রশ্ন করে নি কেন এত মদ গিলেছে সে। সাধারণ স্ত্রীদের মত কোন অনুযোগও করেনি। মনে হয়েছে, লোকটার কোন কাজে বাধা দেবারও অধিকার তার নেই। ইচ্ছেও নেই। লোকটার নিঃশ্বাসে বের হয় বিশ্রী গন্ধ, যেন ওর মনের অতলের ঘৃণ্য স্বরূপটার প্রকাশ ঘটেছে ওই পূতিগন্ধে।

বকুল উঠে এসে বারান্দায় দাঁড়ালো। হঠাৎ মনে হয় সে যেন এমনি এক যন্ত্রণার কারাগারে বন্দী! অসহায় বেদনা আর হতাশায় দু' চোখে জল ভরে আসে। তারাগুলো ঝিকমিক করে মেঘের ফাঁকে, এলোমেলো বাতাস ঝড় তুলেছে।

পরেশের ঘুম আসেনি। দেখেছে সে বকুলকে, ক'দিন আগেও দেখে গেছল সুন্দর একটি মেয়েকে, শান্ত সংযত হাসিখুশী। কথায় ব্যবহারে অল্প সময়ের মধ্যে পরেশের মনে রেখাপাত করেছিল। কয়েক দিনের পর ফিরে এসে পরেশ দেখেছে যেন অন্য কোন্ বকুলকে। চোখের তারায় সেই নিষ্পাপ তৃপ্তির ঔজ্জ্বল্য নেই, মনের কি নিবিড় বেদনার কালোছায়া ওর মুখের কমনীয়তাকে ঢেকে দিয়েছে। বকুলকে প্রমথের ওই ধমকটা ভালো লাগেনি পরেশের।

বুঝেছিল পরেশ, প্রমথ সেই ঘৃণ্য স্বভাবটাকে আজও বদলাতে পারেনি। মেয়েটাকে বিব্রত করে তুলেছে।

পরেশ বাইরে কার পায়ের শব্দ পেয়েছে। বনে-জঙ্গলে ঘোরা তার অভ্যাস। অন্ধকার রাত্রি—ওই টুকরো শব্দগুলোও তার কানে ধরা

পড়ে। ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় তার সজাগ। পরেশ বাইরে এসে দাঁড়ালো, জাফরির উপর মাথা রেখে কাঁদছে বকুল। আবছা অন্ধকারে তার ফোঁপানির শব্দ ওঠে।

বকুলও পায়ের শব্দ পেয়ে ফিরে চাইতে দেখেছে ওই মানুষটাকে। পরেশবাবু তার দিকে চেয়ে আছে, বকুল দেখছে তাকে সাবধানী চাহনি মেলে। তার দিকে এগিয়ে আসছে। বকুল চেনে ওই মানুষগুলোকে, মনে হয় এখুনি ওই দানবটা তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে, বাতাসে মদের গন্ধ উঠছে, বুনো জানোয়ারটা তাকে নিষ্ঠুর আক্রমণে বিপর্যস্ত করে তুলবে, লুঠ করে নেবে তার সব কিছু। বাধা দেবার শক্তিসামর্থ্য কিছুই তার নেই। চীৎকার করেও ফল হবে না। বকুলকে এতবড় অপমানও মুখ বুজে মেনে নিতে হবে।

প্রমথও মদের ঘোরে অচেতন, আর হয়তো মনে মনে প্রমথও সমর্থন করে পরেশবাবুকে, এই ব্যাপারে তারও প্রশ্রয় রয়েছে। স্বার্থপর মানুষটা তাকে বিক্রি করে আজ যেন অনেক কিছু পেতে চায়। পরেশবাবুর সামনে তাই কৌশলে বকুলকে এনে দিয়েছে ওই প্রমথই।

বকুলের সব চেতনা ভয়ে যেন স্তব্ধ হয়ে গেছে। অসহায় মেয়েটার প্রতিবাদের ভাষাও নেই। অজানা ভয়ে সে মূক হয়ে গেছে। চোখ বুজে আসে। বনহরিণীর দিকে হিংস্র একটা বাঘ যেন লাফ মেরেছে ধারালো থাবা আর দাঁত মেলে।

চমকে ওঠে বকুল, মেঘের গর্জন নেই—তার সর্বস্ব লুট করেও নেয়নি কেউ।

পরেশবাবু হাসছে—কি হল বকুল? ভূত দেখার মত চমকে উঠেছিলে কেন?

বকুল জবাব দিতে পারে না। লোকটার চোখের চাহনিতে মত্ত লালসার জ্বালা নেই, শান্ত সহজ সেই চাহনি। বকুল যেন ঠিক বিশ্বাস করতে পারে না। অবাক হয়ে চেয়ে থাকে বকুল ওর দিকে।

পরেশ বলে—ঘুম আসছে না?

বকুল মাথা নাড়ে।

পরেশ বলে—প্রমথটা ঘুমুচ্ছে? ব্যাটা অমনিই। এখানে একা একাই থাকতে হয় বোধ হয় তোমাকে। ওর কাছে চাকরী আর ধান্দাই সবচেয়ে বড়।

বকুলের মনে হয়, পরেশবাবু চেনে প্রমথকে ভালো করেই। আর তার সম্বন্ধে পরেশের ধারণাটা যে খুব উঁচু নয় সেটা বুঝেছে। পরেশ বলে—একা একা এই বনবাসে থাকা সত্যিই কষ্টের। বিশেষ করে অমনি একটা বিচিত্র জীবের সঙ্গে।

কি ভেবে পরেশবাবু শুধোয়—মদ গিলে তোমাকেও জ্বালাতন করে বোধ হয়, আর ওই বাদশাহী মেজাজও দেখায়, না? ব্যাটা হারামজাদা তেমনিই রয়ে গেল।

বকুল চুপ করে থাকে। পরেশবাবুর কথায় একটা আশ্বাস খুঁজে পায়। বকুল একটু হাসল মাত্র।

রাতের প্রহরে শিয়ালগুলো কলরব করে। আবার স্তব্ধতা নামে। বকুল বলে—কালই চলে যাবেন জঙ্গলে?

ওর কথার সুরে একটু আপনকরা ভাব ফুটে ওঠে। পরেশ এ সুরটুকুকে অনুভব করেছে। পরেশ বলে—কাজ রয়েছে অনেক। কাজ ছাড়া থাকবো কি নিয়ে বলো? আর তো কিছু নেই জীবনে।

—কেন ঘর-সংসার, আপনজন! বকুল শুধোয়।

পরেশ হাসছে। দিলখোলা দরাজ হাসি কিন্তু বকুলের মনে হয় সেটা যেন কান্নার চেয়ে করুণ, আর মনের সব নিঃস্বতাকে ঢাকার জন্যই পরেশবাবু ওইভাবে ব্যর্থ চেষ্টা করেছে ওর কথাটাকে উড়িয়ে দেবার। পরেশ হাসি থামিয়ে বলে।

—বেলা কবে গিয়াছে বৃথাই
জানি নাকো তায়,

হঠাৎ পরেশ কেমন চুপ করে যায়। অন্যসুরে বলে—যাও। ঘুমুবে না?

—ঘুম আসছে না। বকুল সহজভাবে জানায় কথাটা। হঠাৎ প্রশ্ন করে বসে বকুল কি কৌতূহল ভরে।

—ওই পাহাড় বনটাকে এখানে থেকে দেখা যায়, না? ওই যে সবুজ পাহাড়ের গায়ে সাদা মন্দির একটা রয়েছে, বৈকালের আলোয় কেমন সোনা রং হয়ে ওঠে, ওই দিকে থাকেন?

রাত্রি নির্জনে পরেশ ওব স্বপ্ন-জড়ানো চোখে যেন মুক্তির ক্ষণিক স্বপ্ন দেখেছে। বন্দী মেয়েটাব জন্য কষ্ট হয়। ওর জগৎ অনেক সীমিত, আর প্রমথের মত স্বার্থপব সংকীর্ণ মানুষের কাবাগারে চিবকালের জন্য বন্দী।

বকুল বলে—ওখানে যেতে খুব ইচ্ছে হয়। ওই মন্দিব, ঘন বন, নীল পাহাড় কখনও দেখিনি। কেমন যেন মন টানে।

পরেশ বলে—ওই দিকেই আমাদের বাংলো। কয়না নদীর ধারে, সোজা পাহাড়ের ধ্বস নেমে গেছে। যাবে তুমি বেড়াতে ওই বনপাহাড়ে?

বকুল ওদিকে যাবার স্বপ্ন দেখেছিল নিখিলের সঙ্গে। ওই রূপজগতেব সন্ধানে সে মুক্তির পথ খোঁজে। আজ জানায়,

—খুব যেতে ইচ্ছে করে।

পরেশ বলে—বেশ তো। ঘবে যাও, রাত অনেক হয়েছে। কাল সকালে কথা হবে। প্রমথকেও বলবো ওখানে নিয়ে যাবাব কথাটা।

বকুলের মনের জমাট বেদনার স্তূপটা অনেক হালকা হয়ে গেছে। একটা কি স্বস্তি বোধকরে বকুল।

প্রমথের ঘুম ভেঙ্গে গেছে আগেই। বিছানাটা খালি দেখে চমকে ওঠে। বকুল নেই। লোকটা কান খাড়া করে শোনে বারান্দায় ওদের কথাগুলো, বকুল আর পরেশের মধ্যে কি কথা হচ্ছে। প্রমথ মনে মনে খুশী হয়। এইটুকুই যেন চেয়েছিল লোভী মানুষটা। বকুল আর পরেশ একটু ঘনিষ্ঠ হোক, ওদের দুজনের মধ্যে এই নিভৃত

আলাপটুকুতে প্রমথের মনে একটা আশা জাগে। একটা উদ্দেশ্য নিয়েই টোপ ফেলেছিল সে, অবশ্য তার আগে চারও করেছিল। সেই চারে বড় রুই মাছ আসবে আর সুগন্ধী মনোহর টোপটাকেও কাজে লাগাবে প্রমথ। সেটা যেন সার্থক হতে চলেছে আজ।

পরেশের এই দুর্বলতাটুকুর সন্ধান পেয়ে খুশী হয়েছে প্রমথ। পায়ের শব্দ ওঠে। পরেশ ওঘরে গিয়ে ঢুকেছে। ওদের কথাগুলোও শুনেছে প্রমথ। দুজনে গোপনে কি যেন পরামর্শ করছে। পরেশ আর বকুল।

পায়ের শব্দে চমকে ওঠে প্রমথ, বকুল ফিরছে। প্রমথ ঘুমোবার ভাণ করে। বকুলের খেয়াল নেই মানুষটার দিকে চাইবার। হালকা ঘুমের ছোঁয়া নামে তার চোখে। প্রমথ দেখছে ওর মুখের শান্ত সহজ ভাবটুকুকে। প্রমথের মুখে-চোখে হাসির ধারালো আভাষ জাগে।

বকুল আজ কোথায় সান্ত্বনার একটু আভাস পেয়েছে। এটা প্রমথের নজর এড়ায়নি, আর সেই জায়গার সন্ধানও পেয়েছে প্রমথ।

সকালের আকাশ আজ মেঘমুক্ত। কালো মেঘগুলো সরে গেছে। ক'দিন পর উজ্জ্বল সোনালী আলোয় ভরে গেছে মাঠ, গাছ-গাছালি ওই পাহাড়গুলো।

বকুল সকালে উঠে স্নান সেরে চা-এর যোগাড় করেছে, প্রমথ আজ অবাক হয়, তার ঘুম ভেঙ্গেছে একটু বেলায়। এ যেন অন্য বকুলকে দেখছে। সদ্যস্নাত চেহারা, এক-রাশ কালো চুল পিঠ ছাপিয়ে পড়েছে, দেহের রেখাগুলো কি খুশীতে মুখর, ছন্দময়। বকুলকে আজ অনেক হালকা আর সুন্দর দেখায়।

পাটভাঙ্গা শাড়িখানায় যেন ওর মনের হালকা ভাব ঝকমকিয়ে ওঠে। প্রমথ বকুলের নোতুনরূপের দিকে চেয়ে থাকে।

পরেশের ঘুম ভেঙ্গেছে। সকালে ওঠা তার অভ্যাস। এর মধ্যে হাতমুখ ধুয়ে পরেশ এসে বসেছে। প্রমথ পরেশকে দেখছে।

প্রমথ আর পরেশের দিকে চা এগিয়ে দেয় বকুল। প্রমথ সাধারণতঃ সকালে বকুলের চায়ের অপেক্ষায় থাকে না, আজ সকালেই চা দিয়েছে বকুল। প্রমথকেই হাল্কা স্বরে বকুল বলে—চল না, আজ ছুটি নিয়ে ওই পাহাড় বনে ঘুরে আসি পরেশবাবুর সঙ্গে। খুব সুন্দর জায়গাটা।

প্রমথ খবরটা শুনে মনে মনে খুশী হয়। প্রমথ সাবধানে এগোতে চায়। আর পরেশকে যেন গেঁথে তুলতে চায় সে। পরেশের কথাগুলো শুনেছে প্রমথ। পরেশ বলে,

—ঢের তো চাকরী করছিস, চল ঘুরে আসবি, আজকের রাতটা থেকে কাল সকালে ফিরবি। জিপ পৌঁছে দিয়ে যাবে।

প্রমথ যেন এইটাই চেয়েছিল। ওর কারবারের হালফিল অবস্থাটাও দেখে আসবে। যদি তার কারবার হাতে নিতে হয় সব খোঁজ-খবরও নেওয়া দরকার। প্রমথ তাই যাবার দরকারও বোধ করে জঙ্গলে।

প্রমথ জানে একদিনের ব্যাপার, নোতুন ছোটবাবুই চালিয়ে নেবে। তবু প্রমথ যেন দয়া করেই যেতে রাজী হয়।

—চল, এত করে বলছিস ঘুরেই আসি।

হঠাৎ প্রমথও বকুলের জন্য দরদী হয়ে ওঠে। তাই জানায় প্রমথ, —এখানে এসে অবধি বকুলও কোথাও বের হয়নি। প্রায়ই বলে। তবে ওখানে গিয়ে দেখবে বন আর পাহাড়। চলো তাই দেখেই আসবে।

পরেশের জিপটাও এসে গেছে। ওরা সকালের ট্রেণ পাস করিয়ে বের হয়ে পড়ে। পরেশ নিজে স্টিয়ারিং-এ বসেছে, বকুলের মুখে-চোখে খুশীর আবেশ। জিপটা চড়াই-এর ওদিকে পথের রেখা ধরে নোতুন জগতের দিকে এগিয়ে চলে।

বকুল পিছনে আর সেই রেললাইন, গজাননের দোকান, তাদের কোয়ার্টারগুলোকে খুঁজে পায় না। তার বন্দী-দশার খাঁচাখানা যেন হারিয়ে গেছে কোন্ দিকে। ঝড়ো হাওয়ায় উড়ছে বকুলের একরাশ

চুল, শাড়ির আঁচলটা অবাধ্য আবেগে খুলে খুলে পড়ে গা থেকে, সিল্কের হালকা শাড়ি উড়ছে জয়ধ্বজার মত।

প্রমথ বকুলের এই মুক্ত উদার আনন্দময় রূপটাকে এর আগে দেখেনি। বকুলকে দেখেছে তারই ঘরের চার দেওয়ালের মধ্যে বন্দী অবস্থায়।

আজ এই মুক্ত প্রকৃতির মাঝে বকুলের নোতুন এক সত্বাকে খুঁজে পেয়েছে প্রমথ। এই বিচিত্র অধরা মেয়েটিকে যেন কোন বাঁধনে বাঁধা যায় না।

প্রমথ একটু বিস্মিত হয়েছে।

বকুলের মনে গান জাগে। ওর মনে হয় তার আশপাশে আর কেউ নেই। একাই ওই সবুজ ছায়ানামা বন-পর্বত, ওই শ্বেত বিন্দুর মত মন্দিরের দিকে চলেছে সে, ওখানে আছে অজানা আশ্বাস, মুক্তির আনন্দস্বপ্ন। বকুল-এর স্বরটা জিপের ইঞ্জিনের শব্দ ছাপিয়ে ওঠে বাতাসে।

অসীম কালের যে হিল্লোলে জোয়ার-ভাঁটায় ভুবন দোলে
নাড়ীতে মোর রক্তধারায় লেগেছে তার টান,
বিস্ময়ে তাই জাগে আমার গান।

পরেশ মুগ্ধ বিস্ময়ে ওই মেয়েটির দিকে চেয়ে থাকে, ওর জীবনের নিঃস্বতাকে দেখেছে। পরেশ জানে বকুল অন্তরে শূন্য, ব্যর্থ। তাই বাইরের এই রূপ-রস-বর্ণ-ভরা জগৎ তার সব শূন্যতাকে কি সম্পদে ভরে দিয়েছে। এই বৃষ্টিবিধৌত শালবনসীমা, আলোকস্নাত নীল পাহাড়, গেরুয়া জলভরা ছন্দমুখরা ওই পাহাড়ী নদী, নীল মেঘমুক্ত আকাশসীমা আজ পরেশের মনেও কি স্বপ্নসম্ভার এনেছে। অনেক পাওয়ার স্বপ্ন। তার মনও যেন কানায় কানায় ভরে উঠেছে। ওই গানের ভাষা পরেশের মনেও সাড়া আনে। পরেশের মনেও যেন হারানো সুর ফিরে আসে।

আকাশ ভরা সূর্য-তারা, বিশ্ব ভরা প্রাণ,

তাহারি মাঝখানে আমি পেয়েছি মোর স্থান,

বিস্ময়ে তাই জাগে আমার গান ॥

বকুলের উজ্জ্বল চোখের তারায় কি দীপ্তি ফুটে ওঠে।

বকুলের সুরে মিশেছে পরেশবাবুর সুর। দু'জনে কোন রূপাতীত জগতে হারিয়ে গেছে।

প্রমথ সেই অনুভূতিগুলোর স্বাদ জানে না। মনে হয় ওদের দেখা, চেনা জগতের বাইরে সে দাঁড়িয়ে আছে, পরেশ বকুল দু'জনে কোথায় অনেক দূরে কোন আলোকরাজ্যে হারিয়ে গেছে। প্রমথ একটু অস্বস্তি বোধ করে।

রাস্তাটা চলেছে পাহাড়েব গা বেয়ে, এপাশে গভীর খাদ। ছায়া ছায়া শাল-মহুয়ার ঘন বনঢাকা পাহাড়, পরেশ নিপুণ হাতে জিপসমেত বাঁক নিচ্ছে আর গাইছে উদাত্তস্বরে।

প্রমথ বলে—দেখে চালা, যা পথ, এখুনি বিপদ ঘটে যাবে। গান তো ছেড়েছিলি আগেই তার এখনও গাস্ দেখছি। তা মরবি নাকি গানের জন্য ?

হাসছে পরেশ—কেন রে ? মরার এত ভয় ? অবশ্যি তুই অনেক পেয়েছিস। আরও পেতে চাস, থাক বাবা, বেঁচে থাক। তোর মূল্যবান প্রাণটা বজায় থাকুক। কি বল বকুল ?

প্রমথ বলে—বনে বাদাড়ে থেকে বুনোই হয়ে গেছিস।

কি রাস্তা রে বাবা !

রাস্তা যা ছিল বৃষ্টিতে ধুয়ে গেছে। এই ভাঙ্গা রাস্তাতেই জিপ চলছে।

জিপের গতি কমিয়ে আনে পরেশ। হঠাৎ বলে ওঠে—এ কাজে এসব হিসেব তো চলে না রে। পথও নেই, আর জঙ্গলের কানুনও আলাদা। ফাইট এণ্ড সারভাইভ।

প্রমথ ওই লোকটার দিকে চাইল। চারিদিকে বন আর পাহাড়। এ তারই রাজ্য, পরেশ এখানে এসে কেমন বদলে গেছে। প্রমথের

ভয় ভয় বোধ হয়। অবাক হয় বকুলকে দেখে। বকুল তন্ময় হয়ে এই ছোট খাট জলপ্রপাতের দিকে চেয়ে থাকে। গাছগুলো বেশ ঘন এখানে। নদীর কলরব ওঠে। বকুল বলে—সত্যিই সুন্দর জায়গা।

প্রমথ বলে—ছাই। পাহাড় ধ্বসছে, বাঘ ভালুকও আছে। বকুল হাসছে, মেয়েটা যেন তাকে চেনে না। ভয়ের কোন চিহ্নও নেই। খুশীতে হাসিতে ও যেন ছড়িয়ে পড়েছে। বকুল বলে,

—বনের জগতে এসব তো থাকবেই। তবু বাঁচতে হবে। ফাইট এ্যাণ্ড সারভাইভ। লড়ো না হয় মরো।

পরেশ বলে—মানুষের জগতেও তার ব্যতিক্রম নেই বকুল। অনেককে বঞ্চিত না করলে অন্যের প্রাধান্য কায়েম করা যায় না সেখানে। কি রে প্রমথ, শাহানসা অব পলাশপুর। কথাটা কি সত্যি নয়?

হাসছে পরেশ হা হা শব্দে।

চমকে ওঠে প্রমথ পরেশের ওই কণ্ঠস্বরে। মনে হয় পরেশ তার মনের গোপন বাসনাটা জেনে ফেলেছে, ও জেনেছে প্রমথ তার সব কিছু গ্রাস করতে চায়, ঠকিয়ে নিতে চায়। তাই যেন মধুর ভাবে ব্যঙ্গ করছে প্রমথকে।

প্রমথ বকুলের উপরও পরেশের লোভ-এর খবরটা টের পেয়েছে। পরেশ সব পারে, তাই বোধ হয় ওকে কৌশলে এই দুর্গম বনের গভীরে এনেছে। তারপর! প্রমথ কথাটা ভাবতেও চমকে ওঠে।

প্রমথ একবার পরেশ আর বকুলের দিকে চাইল। ওদের দুজনের মাঝে যেন একটা গোপন ষড়যন্ত্র গড়ে উঠেছে, তাকে নিঃশেষ করে দেবারই যেন এই চক্রান্ত। প্রমথ ভয়টাকে প্রকাশ করতে চায় না। তাই প্রমথ বলে,

—তোর যতো বাজে কথা পরেশ। বলছিস তো বন ভালো লাগে না, এ সব ছেড়ে দোব। শহরে ঘর বাঁধবো। তবে বাবা শহরের নিন্দে কেন?

প্রমথ পথের বিপদ-এর কথা ভেবে চুপ করে যায়। পাশে গভীর খাদ।

জবাব দিল না পরেশ। পাহাড়ের ওপাশের ঢালু পথ বেয়ে জিপটা নিয়ে চলেছে, ওটা যেন এইবার পিছলে পড়বে, রাস্তার নিশানা ছাড়িয়ে নীচের গেরুয়া ঢলনামা কয়না নদীর বুকে গিয়ে ছিটকে পড়বে জিপটা।

প্রমথের হাত-পা ঘামছে, চোখ বুঁজে জিপের রডটা ধরে আছে। বাঁকের মাথা ঘুরে টিলার উপর বাংলোটার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে জিপটা। প্রমথ তখনও গুম হয়ে আছে।

—বাঃ। বকুল মুগ্ধ বিস্ময়ে রৌদ্রালোকিত ওই আকাশ ছোঁয়া পাহাড়-এর দিকে চেয়ে থাকে। সবুজ বনসীমার বুক থেকে ধোঁয়া ধোঁয়া ভাব উঠছে, সামনে কাঠের প্লাটফর্মের উপর বাংলো, কাঠের ঘর, মাথায় পুরু খড়ের ছাউনি। জিপ থেকে নেমেই থমকে দাঁড়ালো প্রমথ—ওটা কিরে। সর্বনাশ!

বকুলও দেখেছে। একটা রোমশ ভালুক জিপ থেকে পরেশকে নামতে দেখে কালো একটা ঢিবির মত এগিয়ে আসছে। প্রমথ ভীতকণ্ঠে বলে—ভালুক! এট্যাক্ করবে নাকি?

হাসে পরেশ, ভালুকটা ততক্ষণে দুপায়ে দাঁড়িয়ে পরেশকে ধরার চেষ্টা করছে, আর খুশীর আবেগে কুঁই কুঁই আওয়াজ করে। প্রমথ লাফ দিয়ে আবার জিপে উঠে পড়েছে নিরাপদ আশ্রয়ের আশায়। ভালুকটা বোধ হয় পরেশকে আক্রমণ করেছে। বকুল প্রমথর ভয় দেখে হাসছে খিলখিল করে। বকুল দেখছে ভালুকটা পরেশের সঙ্গে পোষা কুকুরের মতই খেলা করছে। পরেশ ভালুকটার গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করে প্রমথকে এই অবস্থায় দেখে বলে —নেমে আয়। ও কুঁইলি। কিছু বলবে না। পোষ মেনে এখানেই রয়েছে। আয়, আয়!

—ওমা হরিণ! বকুল কলকলিয়ে ওঠে। ওপাশে একটা হরিণ মুখ তুলে রয়েছে।

হরিণটা কালো ডাগর চোখ মেলে দেখছে ওদের। পরেশ বলে—তোদের দেখে ঠিক আসতে সাহস করছে না। চল, ঘরে চল। ওটাও এখানেই থাকে।

চাকরটাকে ডেকে পরেশ বলে—ভজুয়া কুঁইলিকে বেঁধে রাখ। প্রমথ নাহলে আসবে না।

পোষ মানলেও যেন পরেশ ভালুকটাকে বিশ্বাস করতে পারে না। বেঁধে রাখে ওকে আজ।

ওদিকে ফাঁকা প্রান্তরে টাল দেওয়া দেওয়া কাঠের গুঁড়িগুলো পড়ে আছে। আর রাশীকৃত জ্বালানীর বিরাট পাহাড়। ট্রাকে করে ওগুলো চালান যায়, কিছু যায় ট্রেণে। ওপাশে লম্বা কতকগুলো চালাঘর। লোকজন, কর্মচারীদের থাকার জায়গা। বাংলোর ঘরটা ওদের থেকে দূরে, আর জানলার নীচেই দেখা যায় টিলার গা সোজা নেমে গেছে, কালো পাথরের স্তরের বহু নীচে নদীটা বয়ে বয়ে চলেছে। পরেশ তাদের নিয়ে টিলার উপরের বাংলোয় এল।

বকুল দেখছে পরেশের ঘরখানাকে। বাঘ-এর চামড়া, বাইসনের শিঙ, হরিণের বড় বড় মাথাও রয়েছে। ওপাশে একটা রাইফেল সাজানো। বকুল অবাক হয়ে দেখছে নোতুন একটা জগৎকে।

পরেশ বলে—বুনো হয়ে গেছি বলতে পারো। ওপাশের ঘরখানায় থাকবে তোমরা। যাও হাতমুখ ধুয়ে নাও গে। চা আসছে।

বকুল নিজের খুশিতে যেন উছল হয়ে উঠেছে। চা আর পরোটা এসেছে। বকুল বলে ওঠে—ওমা এই বুঝি পরোটা? এতো আধপোড়া হয়ে গেছে।

পরেশ বলে—জীবনের কোন সুযোগ তো পাইনি, তাই পোড়া রুটি চিবিয়েই দিন কাটাই।

বকুল হাসি উছল স্বরে বলে—আপনি তো মশাই 'কাওয়ার্ড'।

প্রমথের এসব কথাগুলো ভাল লাগে না। চা পর্ব শেষ করে প্রমথ নিজের কথাটা সারতে চায়, ম্যানেজার বা দু একজন কর্মচারীর

সঙ্গেই আলাপ করার জন্য উঠলো সে। এখানের কর্মচারী গোকুলবাবু মাঝে মাঝে ষ্টেশনে যায় তার কাছে। প্রমথ বলে,

—এলাম, গোকুলবাবুর সঙ্গে একটু আলাপ করে আসি! তোরা কথা-বার্তা বল।

বকুলই সাবধানী স্বরে বলার ভাণ করে—বনের ওদিকে যেও না কিন্তু!

পরেশ হাসতে হাসতে বলে—যা নধর শরীর তোর, চিতেবাঘ দেখলে ছেড়ে নাও দিতে পারে প্রমথ।

প্রমথ বেশ বুঝেছে বকুলও এখানে এসে তাকে যেন ঠাট্টা করতে সাহসী হয়েছে ওই পরেশের ভরসা পেয়ে। মনে মনে চটে উঠলেও প্রমথ জানায়—ঠিক আছে বাবা।

প্রমথ বের হয়ে যেতে পরেশ হাসতে থাকে। বকুল উঠে পড়েছে। ও শুধোয়—আপনার লোকজনের তো অভাব নেই। এ ভাবে সব পড়ে থাকে কেন?

পরেশ শুধোয়—কি হল আবার?

বকুল ওর ওপাশের ঘর, কাজকরার ঘরের অবস্থাটা দেখেছে। বকুল বলে—সব হাণ্ডিল পাণ্ডিল করে ছড়ানো। কাগজ-পত্র, বই-জামা কাপড় বিছানা কি করে রেখেছেন?

হাসে পরেশ—জীবনের মতই সব অগোছালো হয়ে পড়েছে।

—সেগুলোকে একটু গোছাতে পারেন না? বকুল প্রশ্ন করে।

পরেশ জানায়—এতদিন এই ভাবেই চলেছে, চলুক। ক্ষতি কি?

বকুল জবাব দিল না। লোকটার জীবনের একটা শূন্যতার বেদনাকে বুঝেছে সে। অথচ দেখেছে লোকটার মনের কোথাও কোন কাঙ্গাল-পনা নেই। হাহাকারটাকে লালসার উত্তাপে সোচ্চার করে তোলেনি।

এটা বোধহয় প্রকৃতির নিবিড় সান্নিধ্যে থাকার জন্যই ঘটেছে। বকুল অবাক হয়ে নীল মেঘমুক্ত আলোভরা আকাশ, বৃষ্টিধোয়া গাঢ় সবুজ বনরাজ্যের দিকে চেয়ে থাকে। একঝাঁক ঘন নীল ফড়িয়া

কলরব করছে। ওকে দেখে ডাগর চোখের চাহনি মেলে হরিণটা পায়ে পায়ে এগিয়ে আসে।

বিরাট এই প্রশান্তির মাঝে পরেশও যেন ডুবে গিয়ে নিজের তুচ্ছ চাওয়া-পাওয়ার হিসেবটুকুও কি ভুলে গেছে। সে ঠকেছে কি না জানে না। বকুলের মনে হয় পরেশবাবু হয়তো এই জগতে অনেক কিছু পেয়েছে যার তুলনায় ওই ঘর বাঁধার তৃপ্তিটুকুও সামান্য। তবু কি একটা সমবেদনা বোধ করে বকুল।

ওপাশের ক্ষেতে পালংশাক, টম্যাটো কিছু ফুলকপিও রয়েছে।

বকুল খুশিভরে তরকারী তুলতে থাকে। পরেশ বলে—কি হবে ওতে?

বকুল জানায়—খেতে হবে তো? আর ওটার ব্যবস্থা দুপুরে আমিই করবো মশায়। কি করে খান ওই বাজে রান্না?

হাসছে পরেশ—অভ্যেস হয়ে গেছে। তবু একদিন মুখ বদলানো যাবে কিন্তু প্রমথ বলবে, তার বৌকে এখানেও খাটাচ্ছি।

বকুল জানায়—বলুক গে।

পরেশের কাছে এই সামান্য পাওয়াটুকুও ভালো লাগে। এ যেন অনেক পাওয়া। এই শাল মহুয়ার বনরাজ্য, টিলার নীচের ঝোরাটা, বাতাসে শালফুলের সুবাস, কতো পাখীর কলরব মুখর এই জায়গাটা আজ নোতুন রূপে ধরা দেয়।

আর বকুলের স্তব্ধ রুদ্ধ জীবনে আজকের দিনটুকু এনেছে বুকভরা মুক্তির আশ্বাস। ঝোরাটাকে বাঁধ দিয়ে ছোট জলাশয়ের মত করা হয়েছে। সামনে উঠে গেছে টিলার উঁচু পাথরের স্তর। বকুল খুশিভরে ওই জলে নাইতে নেমেছে।

মনে হয় তার পরেশবাবুর জীবনের অপরিসীম শূন্যতার বেদনাটা তাকে কোথায় বিচলিত করেছে।

প্রমথ নিজের কাজ নিয়ে ব্যস্ত। এর মধ্যে সে ম্যানেজারবাবু আর গোকুলবাবুকে ধরে কিছু খবরও বের করেছে। পরেশের ব্যবসার

অবস্থা ভালোই। কাঠের গুঁড়ির সাপ্লাই-এর অর্ডার ও রয়েছে অনেক। আর বনের গভীরে অনেকটা ভালো জঙ্গল তার ইজারা নেওয়া আছে। অর্থাৎ দেখে শুনে চালাতে পারলে এ ব্যবসায় আরও অনেক কিছু করা যায়।

প্রমথের লোভী মন আজ অনেক কিছুই স্বপ্ন দেখে।

বেলা হয়ে গেছে। টিলার ধারে দাঁড়িয়ে প্রমথ যেন স্বপ্ন দেখছে। এই সব বাংলো ওই জঙ্গলের অনেকটাই তার দখলে এসে গেছে, আর প্রমথ নিজেও করাত-কল খুলবে পলাশপুরে। অবস্থা ফিরে যাবে তার।

হঠাৎ নীচের ছায়ানামা অরণ্যের দিকে চেয়ে অবাক হয়, পরেশ আর বকুলকে দেখে। বকুল সদ্যস্নান সেরে একটা কচি কলাপাতা রং-এর শাড়ি পরেছে। খোঁপায় দিয়েছে কতকগুলো সাদা সদ্যফোটা বনকুর্চ ফুল। হাসছে বকুল।

প্রমথ সরে এল ওদিক থেকে।

দুপুরে খাবার আয়োজন দেখে পরেশও অবাক হয়। তরি-তরকারী, মাংস আর পায়েসও করা হয়েছে। প্রতিটি রান্নার স্বাদও বিচিত্র। প্রমথ দেখছে বকুল একদিনেই যেন এখানের একজন হয়ে গেছে। নিজেই চাকর-বাকরদের তদারক করছে। রান্নাঘরেও কাজে ব্যস্ত থাকতে দেখেছিল বকুলকে।

পরেশ খাবার টেবিলের দিকে চেয়ে অবাক হয়।

—এত সব করলে কখন?

হাসছে বকুল। ওর চোখ দুটো কি যেন তৃপ্তিতে চক চক করে ওঠে। বকুল বলে—হয়ে গেল। নিন্ বসে পড়ুন।

প্রমথ দেখেছে বকুলের মনে চাপা খুশীর প্রকাশ।

পরেশ শুধোয়—তোমার কই?

বকুল বলে—আপনাদের খাওয়া হলে তবে তো—

—না। না। একসঙ্গেই খেতে হবে। বসো।

পরেশ একটু জেদের স্বরেই কথাটা বলে। প্রমথ দেখছে

বকুলকে। বকুল বাসাতে স্বামীর সঙ্গে খায় না। ওটা নাকি সুগৃহিনীর অন্যতম পরিচয়। স্বামীর সেবা করে তবে নিজে খাবে। কিন্তু এখানে বকুলও যেন বদলে গেছে।

পরেশ বলে—একসঙ্গে খেতে খেতে গল্প হবে। বসো। প্লেটে প্রথমে কিছু সার্ভ করে নিই।

প্রমথ চুপকরে দেখলো, বকুলও ওদের সঙ্গেই খাবার টেবিলে বসেছে। আজ এখানে এসে বকুল যেন ইচ্ছে করেই প্রমথকেও একটু জবাব দিল, আজ বকুলের সেই সাহসটা বেড়ে গেছে পরেশের জন্যই।

প্রমথ খেয়ে দেয়ে উঠে পড়ল। বলে সে—বেশ গুরু ভোজন হয়ে গেছে পরেশ। দুপুরে একটু নিদ্রা দিতে হবে।

পরেশ বলে—ওই আয়েস করেই তোর নেওয়াপাতি ভুঁড়িটা হয়েছে। বনে বাদাড়ে থাকি ওসব আয়েস সয় না।

প্রমথের ঘুম আসে।

বকুল দৌড়ে ফিরছে হরিণটার পিছনে। ভালুকটাকে ও চেয়ে দেখে, ওদিকের লম্বা ঘরটায় বসে পরেশ কি জরুরী কাগজপত্র দেখছে, লোকজনদের কাজের নির্দেশ দেয়।

বকুল এখানে মুক্ত, স্বাধীন ওই বনহরিণীর মতই। হঠাৎ চোখে পড়ে দূরে পাহাড়ের বনসীমার উপরে সেই সাদা মন্দিরটাকে। রূপালী বিন্দুর মত নীল আকাশে চক চক করে সেই মন্দিরটা।

—কি দেখছো?

বকুল চাইল। পরেশও তখন বের হয়ে এসেছে। বকুল বলে,

—ওটাকে দেখছি। ওখানে যেতে খুব হচ্ছে হয়। যাওয়া যায় না?

পরেশ বলে—হয়তো যায় তবে আদিবাসীরা বলে ওখানে কোন বোঙা, ওদের দেবতা আছে। ওখানে তাবা যেতে পারে না। দূর থেকেই নমস্কার করে।

বকুলের মনে হয় ঠাঁই টায় রয়েছে কোন পরম সম্পদ। তাই যেন ওটাকে নিয়ে এই সব রটনা, নিষেধের বেড়া।

তার জীবনের অনেক পাওয়ার স্বপ্নের মতই। সেখানে যাবার নিষেধ রয়ে গেছে অনেক।

পরেশ বলে—আমারও খুব ইচ্ছে করে একদিন ওই খাড়া পাহাড় আর বন পার হয়ে ওখানে যাই। বার বার ওই উজ্জ্বল বিন্দুটা আমাকে টানে।

বকুল দেখছে পরেশকে। বনের রূপে মুগ্ধ বিবাগী একটা মানুষ। পরেশ বলে,

—আবার মনে হয় কি জানো? অনেক কিছুই তো অমনি উজ্জ্বল স্বপ্নময় বলে বোধ হয়। সেগুলোকে তবু পাই নি। দূর থেকে দেখে কল্পনা করেই খুশী হতে হয়েছে। তাই মনে হয় ওখানে ওই উজ্জ্বল বিন্দুটাকে ছুঁয়েই বা লাভ কি? অধরা তারার মতই দূর আকাশে ও জেগে থাকুক।

পরেশের কথায় বকুল কি একটা বেদনার সন্ধান পায়। বকুল শুধোয়—তাই কি সব স্বপ্ন নিয়ে এই বনবাসের নির্বাসন মেনে নিয়েছেন?

পরেশ জবাব দিল না, একবার ওর দিকে চাইল। বকুলের সন্ধানী দৃষ্টিতে সেই নিঃস্বতার বেদনাটুকু ধরা পড়েছে। পরেশ সরে গেল, হয়তো এড়িয়ে গেল তাকে।

প্রমথের ঘুম ভেঙ্গেছে। বাংলোর জানলা থেকেই দেখেছে দৃশ্যটা। পরেশ আর বকুলের চোখের নীরব ব্যাকুলতার ভাষাটুকুর অর্থও ধরা পড়েছে তার সন্ধানী চাহনিতে। প্রমথের মনে হয় এখানে বকুলকে এনে একটা ভুলই করেছে সে।

পরেশের ভারি কণ্ঠস্বর শোনা যায়। প্রমথকে ডাকছে পরেশ।

—কইরে ঘুম ভাঙ্গলো? চা এসে গেছে। উঠে আয়।

প্রমথ সদ্য ঘুম থেকে ওঠার ভাণ করে চোখ মুছতে মুছতে বের হয়ে এসে দেখে চায়ের আয়োজন করে ফেলেছে বকুল। এরই মধ্যে! চাকরটা বিস্কুট দিতে এসে খবর দেয়।

—একটা চিতে বাঘকে ওদিকের বনে দেখা গেছে স্যার!

প্রমথ চমকে ওঠে,—চিতে বাঘ! এখানে?

পরেশ চায়ে চুমুক দিয়ে হাল্‌কা স্বরে জানায়।

—লিওপার্ড! ছোট সাইজের। ওসব তো আছেই এখানে। ও তেমন কিছু করে না ওরা। নে, চা খা!

প্রমথ চায়ে চুমুক দিতে থাকে। তবু ভয়টা তার যায় নি।

সন্ধ্যার তারাগুলো জেগে ওঠে মেঘমুক্ত আকাশের আঙ্গিনায়। বকুল বের হয়েছে টিলার নীচে ছোট নদীটার সাঁকো পার হয়ে বনের কাছে। প্রমথ বের হতে চায় না। সাবধান করে বকুলকে—নাই বা বেরুলে রাতের অন্ধকারে এই বনে বাদাড়ে।

বকুল আজ এখানে এসে মুক্তির স্বাদ পেয়েছে। সে বলে,

—কিসের এত ভয়!

পরেশ আর সে এসেছে। প্রমথ ওদিকে ম্যানেজার বল্লভবাবুর ঘরে বসেছে, ওর মন কারবারের হিসেব-নিকেশের দিকে ব্যস্ত। কথা বলার ফাঁকে প্রমথ আরও কিছু জানতে চায়।

একফালি চাঁদের আলোভরা বনপাহাড়। ঝোবার কল্লোলমুখর আকাশ, বাতাসে ওঠে বনকুর্চি, ল্যাটার্নি ফুলের মদির সুবাস। পরেশ আর বকুল চলেছে দু'জনে। বকুলের সুর জাগে।

তোমায় কিছু দেব বলে চায় যে আমার মন,
নাই বা তোমার থাকলো প্রয়োজন।
যখন তোমার পেলাম দেখা, অন্ধকারে একা একা
ফিরতে ছিলে বিজন গভীর বন।
ইচ্ছা ছিল একটি বাতি জ্বালাই তোমার পথে,
নাই বা তোমার থাকল প্রয়োজন॥

পরেশ তন্ময় হয়ে শুনছে ওই গানটা, আজ পরেশ দেখছে বকুলকে, তার ব্যর্থ জীবনের শূন্যতাকে। অসহায় ওই বকুলের সারা মনের

হাহাকার মেশানো ওই সুর, পরেশ শহর থেকে অনেক আশা স্বপ্ন নিয়ে ফিরেছিল, একটি নীড় বাঁধার স্বপ্ন। ভেবেছিল প্রথমে, প্রমথও ঘর বেঁধে সুখী হয়েছে। সহরের বসন্ত, ললিত, পুতুল অনেকেই শান্তি পেয়েছে।

কিন্তু বনবাসী পরেশের জীবন সম্বন্ধে এই গভীর বেদনাবোধ ছিল না। বকুলকে দেখে চমকে উঠেছে সে। প্রমথ, বকুল, বসন্ত, পুতুল ওরা সকলেই এমনি বেদনাহত এক একটি দ্বীপ। ওদের চারিদিকে উর্মিমুখর লবণাক্ত সিন্ধুতরঙ্গ। সুখী! ওরা সুখের ভাণ করেছে মাত্র, স্বামী-স্ত্রীর অভিনয় করে চলেছে। বাইরে থেকে বোঝার উপায় নেই সেই ভাণটুকু। মনের অব্যক্ত কান্নাটাকে দেখেছে পরেশ। প্রমথ বকুলের মাঝে সেই যন্ত্রনাটাকেও অনুভব করেছে আজ পরেশ।

বকুল ওর দিকে চাইল। চাঁদের আবছা আলোর আভাস ওর দু' চোখে। পরেশ বলে ওঠে—জীবনের দুঃখ হতাশাকে এড়িয়ে সুখ-শান্তিটুকুকেই পেতে চাও বকুল?

বকুল আজ আর্তকণ্ঠে প্রথম স্বীকার করে,

—জীবনের একটা বিরাট ভুলকে সয়ে নিতে পারছি না। এ জীবন বিষিয়ে উঠেছে। মেনে নেবার চেষ্টাও করেছি, কিন্তু যেখানে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ভালোবাসার কোন সম্পর্ক নেই, স্ত্রী মানে টাকায় কেনা বাঁদী, সেখানে বাঁচা যায় কি করে?

পরেশ অবাক হয়ে ওর দিকে চাইল, এসব জটিলতার প্রশ্ন, এ বেদনা পরেশের জানা নেই। তবু অবাক হয়ে বলে, প্রমথ—ছোট শাহানশা এসব বলে নাকি? বলে কেনা বাদী?

বকুলের চোখের সামনে ভেসে ওঠে অতীতের সেই রাত্রির দৃশ্যগুলো, একটা মত্ত পশু যেন দুর্বার লালসা নিয়ে তাকে আক্রমণ করেছিল, আর দাবী জানিয়েছিল তার অধিকারের।

বকুল সে কথা ভাবতেও শিউরে ওঠে। বলে সে,

—দু' হাজার টাকা আমার গরীব বাপকে দিয়ে ও নাকি আমাকে কিনেছে। আমি তো ওর কেনা বাঁদী।

পরেশ চমকে ওঠে—ইডিয়ট কোথাকার!

বকুলের দিকে চাইল পরেশ, ওর এই সমস্যা থেকে মুক্তির সন্ধান সে জানে না। পরেশের নিজের কাছেই বিচিত্র বোধ হয় ব্যাপারটা। বকুল মুক্তি চায়, আর পরেশ চেয়েছিল এই মুক্তির জীবন থেকে সরে গিয়ে একটি বন্ধনকে। কিন্তু ওদের দেখে চমকে উঠেছে পরেশ। এ যন্ত্রণার কথা তার জানা ছিল না। পুরুষের এই নীচতাকে চেনে নি সে।

নিজের মত্ত স্বভাবটাকেই দেখে এসেছে পরেশ এতদিন। মদ গিলেছে আর প্রয়োজনে দেহের ক্ষুধা মেটাতেও দ্বিধা করেনি। আজ বকুলকে সে দেখে কি বেদনার্ত চোখ নিয়ে, ওর জন্য দুঃখ হয়।

সেই দুর্মদ মানুষ পরেশ বোসও আজ দৈহিক ক্ষুধা আর দেহসর্বস্ব লালসা ভুলে পরম একটি বেদনাময় মুহূর্তের অস্তিত্বকে প্রত্যক্ষ করেছে। এরই নাম হয়তো ভালোবাসা। পরেশ নোতুন একটা সমবেদনা অনুভব করে। কি যেন চায় সে। কামনার জ্বালা নেই, বেদনার রঙেও নীল সেই চাওয়াটুকু।

পরেশ আর বকুল দুজনে ফিরছে বাংলোর দিকে। বকুল বলে,

—এই রাত্রি, মুক্তির এই স্বপ্নটুকু অনেক দিয়েছে আমায়।

মাথার উপর দূর পাহাড়ের সবুজে সেই সাদা মন্দিরটা চাঁদের আলোর মাঝে জেগে আছে উজ্জ্বল অস্তিত্ব নিয়ে। বকুলের মনে হয়, ওই দূর মন্দিরের পথে সে চলেছে, বাতাসে ওঠে ধূপের সুরভি, দূরাগত ঘণ্টার মৃদু ধ্বনি শোনা যায়। সেই সূর্যালোকিত পথে সে উঠে যাবে, হারিয়ে যাবে পাখীর কাকলিমুখর কোন নীলিমার সুদূরে।

—কি ভাবছো? পরেশের কথায় চাইল বকুল। জবাব দিল না, ওই বিচিত্র অনুভূতির গভীরে সে হারিয়ে গেছে।

প্রমথ চেয়ে দেখছে ওদের তুজনকে সন্ধানী দৃষ্টি মেলে। পরেশ আর বকুলের মুখ-চোখে কিসের সন্ধান করছে ধূর্ত লোকটা। বকুল বাংলোর ওপাশের ঘরে গিয়ে ঢুকলো।

রাত্রি নেমেছে। প্রমথ এমনি একটা সুযোগের অপেক্ষাতেই ছিল। চারিদিক নিস্তব্ধ। বনের গাছ-গাছালির আড়াল থেকে কয়নার জল-কল্লোল ভেসে আসে। পরেশ আজ মদ নিয়ে বসলেও তেমন খায়নি।

মানুষের জগতের সংস্পর্শে এসে সে যেন ভাবনায় পড়েছে। বকুলের কান্নাভেজা কথাগুলো মনে পড়ে। প্রমথ অবশ্য এর মধ্যেই বেশ খানিকটা মদ গিলেছে। আবছা আলোয় ঘরের মধ্যে বাঘের মুণ্ডুগুলো, বাইসনের বিরাট মাথাটা কেমন আরণ্যক পবিবেশ এনেছে। প্রমথ বলে ওঠে, মানে বকুলও বলছিল, জায়গাটা তার খুব ভালো লেগেছে।

পরেশ চাইল প্রমথের দিকে। ওর মুখে লোভ-এর ছাপ পরিস্ফুট হয়েছে। পরেশ আজ ঘৃণা করে ওই লোকটাকে। বকুলের কথাগুলো মনে পড়ে। পরেশ জবাব দিল না। প্রমথ এর মধ্যেই বেশ খানিকটা মদ গিলেছে। মুখখানা চকচক করছে। পরেশ দেখছে লোভী-নীচ এই প্রমথকে। ওর কথার মধ্যে বকুলের প্রতি যেন গভীর মমত্ববোধ ফুটে ওঠে। আর সেটা যে কতটা মিথ্যা তা জানতে বাকী নেই পরেশের। প্রমথ এই সুযোগে তার এতদিনের বাসনাটা আজ প্রকাশ করে। প্রমথ জানায়,

—তাই ও বলছিল, তুই তো কারবার তুলে দেবার কথা ভাবছিলি, বকুল এখানেই থাকুক, আমি আসা-যাওয়া করবো। কারবারটা আমিই দেখাশোনা করি। তুই শহরে বাড়িটাড়ি কর—সেখানে গিয়ে ভদ্রলোকের মত থাকতে পারবি।

পরেশ ওর মনের কথাটা বুঝতে পেরেছে। বকুলকে এখানে রেখে

দিয়ে তার কাছ থেকে ওইগুলো আদায় করে নিতে চায়। অর্থাৎ তার স্ত্রীকেও চরম অপমান করে রোজগার করতে চায় প্রমথ।

সন্ধ্যাবেলায় বকুলের কথাগুলোর মধ্যে গভীর যন্ত্রণাটাকে আজ আবিষ্কার করেছে পরেশ। বকুলকে টোপ হিসাবে ব্যবহার করে পরেশের মত জানোয়ারকে ঠকাতে চায় প্রমথ।

পরেশ শুধোয়—বকুল রাজী হবে এই কেনা-বেচায়?

প্রমথ হাসছে বিজয়ীর হাসি। বলে সে গলা নামিয়ে,

—তোকে ওর খুব পছন্দ। শহরের মেয়ে—গান-বাজনাও জানে। অবশ্যি শহরে যদি বাড়ি করিস, ওর মত মেয়েকে সেখানেও মানাবে ভালো। আর মনে হয় বকুলেরও অমত হবে না।

পরেশের মনে হয় সাপটে লোভী লোকটার গালে একটা চড় কসে দেয়। কিন্তু পারে না। লাথি মেরে পায়ের কাছে শূন্য মদের বোতলটাকে হঠিয়ে দিয়ে সেই রাগটাকে প্রকাশ করে পরেশ গম্ভীরভাবে বলে ওঠে,

—বকুল এখানে থাকবে না, তোর কাছেও নয়। দু' হাজার টাকা দিয়ে ওকে কিনেছিলি, সেই টাকাটা আমিই তোকে দিয়ে দোব, ওই দাম ফিরিয়ে নিয়ে তোর ক্রীতদাসীকে চলে যেতে দে। ওর জগতে ফিরে যাক বকুল। তোর মত অমানুষ লোভী বর্বরের স্বামী সাজারও কোন অধিকার নেই। ইতর—জানোয়ার তুই।

—কি বলছিস পরেশ?

প্রমথ চমকে ওঠে। মদের মাত্রাটা বেশী হয়ে গেছে। ওই পরেশের লোভী সত্তাকে চেনে সে। আর বকুল যে গোপনে তাকে অনেক কিছু বলেছে, মানসিক দিক থেকে ওরা দুজনে পরস্পরের অনেক কাছাকাছি এসেছে এটা বুঝেছে প্রমথ। তাই প্রমথ বলে ওঠে কঠিন স্বরে পরেশের মুখের উপর,

—অর্থাৎ মাত্র দু'হাজার টাকা দিয়ে আমার কাছ থেকে ওকে সরিয়ে নিজের দখলে আনতে চাস ওই মেয়েটাকে! এত সস্তায় হবে না।

প্রমথ কি ভেবে শোনায়—তাহলে দরটা একটু চড়া পরেশ, এখান থেকে চলে যা ব্যবসা আমাকে দিয়ে। বকুল যদি চায় তোর সঙ্গে যাবে। বাইরের লোক জানবে বন পাহাড়ে অ্যাকসিডেন্ট হয়ে বকুল মারা গেছে। আর ফেরেনি। এ্যাঁ?

প্রমথ হাসছে মুখ টিপে টিপে। এতক্ষণে যেন তার আসল কথাটা জানাতে পেরেছে পরেশকে। পরেশকে চুপ করে থাকতে দেখে প্রমথর মনে হয় পরেশ দরটার কথা ভাবছে। প্রমথ বলে,

—এমন কিছু বেশী দর বলিনি। আর বাকীটা সব ম্যানেজ করে দোব। এসব কথা কেউ জানবে না। বকুলের মত মেয়ের জন্য এটা নাথিং।

পরেশ অবাক হয়ে প্রমথের এই জঘন্য কথাগুলো শুনছে, ভাবতে পারেনি সে যে প্রমথ সত্যিই এত নীচ। এই ঘৃণ্য কথাগুলো পরেশ যেন বিশ্বাস করতে পারে না। ওর সারা দেহে একটা অসহ্য জ্বালা ফুটে ওঠে। দুটো হাত শক্ত হয়ে উঠেছে, মনে হয় এই মুহূর্তে ওই লোভী মানুষটার কণ্ঠনালী টিপে ধরে তিলে তিলে তাকে শেষ করে দেবে, রাইফেলটা নজরে পড়ে। কোন রকমে মনের তীব্র জ্বালাটাকে চেপে পরেশ ডাক দেয় চাপা স্বরে—কুঁইলি! কুঁইলি—শ-শ্।

বারান্দায় ধুপ-ধাপ শব্দ ওঠে অন্ধকারে। ভালুকটা রাতের অন্ধকারে ছাড়া থাকে বাংলোর এলাকায়, পরেশের ডাক শুনে কালো জানোয়ারটা এসে ঘরে ঢোকে। দু'চোখে ভালুকটার পিঙ্গল আলো ঠিকরে পড়ে, ধারালো সাদা দাঁতগুলো কালো মুখে উল্সে ওঠে। রাতের বেলায় ভালুকটার আদিম হিংস্ররূপ ফুটে উঠেছে। ঘরে ঢুকে ভালুকটা দেখছে তাদের, প্রমথও ভীত চাহনি মেলে দেখছে ওটাকে, ভালুকটা তাকে যেন সহ্য করতে পারে না—গর-গর-শব্দ করছে।

—পরেশ! প্রমথ চমকে ওঠে ওর দিকে চেয়ে।

পরেশ স্থির কণ্ঠে বলে—এত নীচ তুই ভাবিনি। বকুলকে ওই বিকি-কিনির বাজারে কোন দামই দিতে হবে না আমায়। কুঁইলিকে লেলিয়ে দিলে এক মুহূর্তে তোকে ছিঁড়ে ফালা ফালা করে শেষ করে

দেবে। পুলিশও জানবে—বনে এসে ভালুকের হাতে শেষ হয়ে গেছিস। ন্যাচরাল ডেথ। তারপর—

প্রমথের মুখে চোখে ফুটে ওঠে ভয়ের আর্ত ভাব, অস্ফুট কণ্ঠে আর্তনাদ করে সে। আজ মনে হয় পরেশ সব পারে। এমনি একটা কিছু করার জন্যই তাকে ও ডেকে এনেছে। ভালুকটা প্রমথের মুখে চোখে ভয়ের চিহ্ন দেখে আর বিকৃত আর্তনাদ শুনে যেন ক্ষেপে উঠছে। রাগে ফুলে উঠেছে ওর রোমশ দেহ, গলার শব্দটা বাড়ছে। এখুনিই প্রমথকে ধরে ফেলবে ওর বলিষ্ঠ আলিঙ্গনে। আর্তনাদ করে প্রমথ।

—পরেশ! তোর দু'টি পায়ে পড়ি পরেশ—বাঁচা। বাঁচা আমাকে।

—কেন রাজ্যলাভের সখ মিটে গেল? হাসছে পরেশ। আর তাদের চিৎকার ছাপিয়ে জানোয়ারটা গর্জাচ্ছে। পরেশ এক হাতে কুঁইলির গলার বকলেসটা ধরে আছে, ছেড়ে দিলেই চরম সর্বনাশ ঘটে যাবে। প্রমথের ভীত আর্ত কণ্ঠের চীৎকারে হাসছে পরেশ বিকৃত স্বরে।

বকুলের ঘুম ভেঙ্গে গেছে ওই বিজাতীয় গর্জনে। বনের মাঝে কোন বন্যজন্তুর চীৎকার উঠছে বোধ হয়। আর প্রমথের আর্তনাদও শুনেছে বকুল।

কি ভেবে ওদিকের ঘরের দরজার সামনে এসে থমকে দাঁড়ালো বকুল।

আবছা অন্ধকারে দেখছে ভালুকের জ্বলন্ত আংরার মত হিংস্র চোখ দুটোকে। পরেশ হাসছে। বকুল প্রমথকে এভাবে করুণ আর্তনাদ করতে এর আগে দেখেনি। অবাক হয়ে দেখছে বকুল ওদের দু'জনকে।

প্রমথ জেনেছে বাঁচার কোন আশাই নেই, হঠাৎ পিছনে বকুলকে দেখে মনে হয় ওই তাকে বাঁচাতে পারে। ওই বকুলই এই হিংস্র মারমুখী পরিবেশের মাঝে তাকে আশ্বাস দিতে পারে।

—বকুল। প্রমথ এগিয়ে এসেছে ওর কাছে। আর্তনাদ করে প্রমথ বকুলকে দেখে।

—পরেশ আজ মেরে ফেলতে চায় আমাকে, বকুল।

—কি ব্যাপার ?

বকুল চাইল পরেশেব দিকে। পরেশ দেখেছে বকুলের চোখে নীরব বিস্ময় আর প্রশ্ন। হয়তো অমানুষিক এই অত্যাচারের প্রতিবাদের কাঠিন্যই ফুটে উঠেছে বকুলের চোখে।

পরেশের এই চরম আঘাত দেবার প্রয়োজন ছিল প্রমথকে। পাশবিকতার প্রকৃত স্বরূপ কত নিষ্ঠুর হতে পারে এর পরিচয়ও জানানোর দরকার ছিল প্রমথকে। তার মাঝে বকুলেব স্থির সংযত আশ্রয়দাত্রীর ওই ভূমিকাটুকু মুগ্ধ করেছে পরেশকে। বকুল অবাক হয়ে শুধোয় পরেশকে।

—এ কি করছো তুমি ?

পবেশ ভালুকটাকে টেনে বাইবে নিয়ে গিয়ে চেনে বেঁধে রেখে ফিরে এসে প্রমথকে দেখছে। ভয়ে বিবর্ণ লোকটা ঘামছে—তখনও ওর মুখ-চোখ বিবর্ণ। বকুলই এখানে তার একমাত্র আশ্বাস, প্রমথ এই ভেবে ওর কাছেই একটা চেয়ারে বসে পড়ে হাঁফাচ্ছে।

পরেশ দেখছে ওই লোভী মানুষটাকে। জানাতে পারে না সে বকুলকে ওর মনের অতলের সেই লোভটাকে, বলতেও বাধে যে প্রমথ এই বকুলের বিনিময়ে অনেক কিছু বাণিজ্য করতে চেয়েছিল।

পরেশ বলে—কি হয়েছিল বল প্রমথ ? বল কি বলেছিলি ? কি দর দিয়েছিলি এইসব ব্যবসাপত্র পাবার জন্য, বল বকুলকে।

প্রথম ব্যাকুল কাতর চাহনি মেলে যেন অনুনয় করছে পরেশকে।

বকুলও বুঝতে পারে ব্যাপারটা, এমন কোন কথাই বলেছিল প্রমথ পরেশকে যেটা সে বকুলের সামনে বলতে দ্বিধাবোধ করে। বকুলের কাছে ব্যাপারটা রহস্যের মতই বোধ হয়।

পরেশ বলে—যাও, শুয়ে পড় গে। রাত্রি হয়ে গেছে।

পরেশ এ নিয়ে যেন কোন মন্তব্য করতে চায় না। বকুল ব্যাপারটা কিছুই বুঝতে পারে না। প্রমথ তখনও নিজেকে সামলাতে পারেনি, তার লোভীমন এই চরম আঘাতে মুষড়ে পড়েছে। পরেশ বকুলের কাছে কিছুই জানাতে চায় না এ ব্যাপারে। তাই বের হয়ে গেল।

প্রমথ বলে—উঃ মাতালের কাণ্ড যাকে বলে। ভালুকটাও তেমনি। চলো, ও দরজাটা বন্ধ করে দাও। যত্তো সব!

বকুল প্রমথের বিরক্তির কারণটা ঠিক বুঝতে পারে না।

প্রমথ বকুলের দিকে চেয়ে থাকে, আজ তার সব পরিকল্পনা-ভাবনাগুলো ওলট পালট হয়ে গেছে।

বকুলও ইচ্ছে করলে পরেশের সঙ্গে যোগ দিয়ে প্রমথকে শেষ করে দিতে পারতো, কিন্তু বকুল তা করেনি। প্রমথের মনে হয় বকুল সম্বন্ধে হয়তো ভুল ধারণাই করেছিল সে। বকুল পরেশের এই প্রস্তাবে হয়তো রাজী হয়নি।

প্রমথের ঘুম তেমন গাঢ় হয়ে আসেনি। যে আশা নিয়ে এখানে এসেছিল সে সেটা ব্যর্থ হয়ে গেছে। ভেবেছিল পরেশ-এর মত মাতাল লম্পট একটা মানুষকে সহজেই এই লোভ দেখিয়ে নিজে এই সবকিছুরই মালিক হয়ে বসবে। বকুলকে তার জীবনে তেমন দরকার নেই। প্রমথের চাই টাকা—প্রতিষ্ঠা।

কিন্তু তা হয় নি।

পরেশ বিনাপয়সাতেই বকুলকে পেতে চেয়েছিল, দরকার হলে তাকে এই জানোয়ারটাকে দিয়েই খুন করিয়ে ফেলতো। কিন্তু তা হয় নি।

বকুল এসে পড়াতে বোধহয় পরেশের ওই মতলবটা ভেস্তে গেছে।

রাত ভোর হয়ে আসছে।

বকুল চেয়ে দেখছে ভোরের আকাশ জুড়ে আলোর প্রথম পরশটুকুকে।

আঁধার বিদীর্ণ করে লাল্‌চে রং-এর ঢেউ জেগেছে আকাশ জুড়ে। কলরব করে পাখীগুলো, স্তব্ধতার মাঝে ঝোরার ঝর ঝর শব্দটাও বৈচিত্র্য এনেছে।

—কিরে ঘুম হয়েছিল কাল রাতে? পরেশ শুধোয় প্রমথকে।

প্রমথ চায়ের টেবিলে বসে চা খেতে খেতে চাইল পরেশের দিকে। আজ তাকে মনে হয় অন্য মানুষ। ওর কথার স্বরে ব্যঙ্গেরই আভাষ ফুটে ওঠে।

প্রমথ জানায়—না। ভালোই ঘুমিয়েছি।

বকুল এর মধ্যে শাড়িটা বদলে ফেলেছে। সামান্য প্রসাধনেই ওকে সুন্দর দেখায়। সকালের মিষ্টি আলোর আভাষ ওর মুখে। প্রমথ বলে—আজই সকালে ফিরে যাবো পরেশ।

পরেশ প্রমথের দিকে চাইল। পরেশ বেশ বুঝেছে প্রমথের কাজ এখানে শেষ হয়েছে। বকুলও শুনেছে কথাটা। তাই অবাক হয় সে।

—সকালেই ফিরবে?

প্রমথ জানায়—হ্যাঁ। জরুরী কাজ আছে।

পরেশ কি ভাবছে। প্রমথ জানায়,

—জিপ্‌ না হলে হেঁটে ওই কয়লা খনিতে চলে যাবো। ভূষণ ড্রাইভার মালগাড়ি নিয়ে আসবে, তাতেই যেতে হবে।

অর্থাৎ পরেশের আর কোন সাহায্য সে চায় না। পরেশ সেটা বুঝেই বলে—জিপ্‌ পৌছে দিয়ে আসবে তোদের।

পরেশও ওই ব্যাপারটাকে মেনে নিয়েছে। তাই সহজ ভাবেই বলার চেষ্টা করে—তাহলে তৈরী হয়ে নে।

প্রমথ উঠে গেছে। এখানে থাকার আর বাসনা তার নেই। চলে যাবে। বকুল চুপ করে দেখছে পরেশকে। পরেশবাবুও কোন অনুরোধ করে নি থাকার জন্য। সহজ ভাবেই ওদের চলে যাওয়াটাকে মেনে নিয়েছে।

বকুল তবু কালকের রাতের কথাটা ঠিক বুঝতে পারেনি!

বকুল শুধোয়—কাল রাতে কি হয়েছিল?

পরেশ ওর কথায় চাইল বকুলের দিকে। পরেশও চায় না বকুলকে ওই কথাটা শোনাতে।

তাই শুধোয় সে—প্রমথ তোমাকে কিছু বলে নি?

—না! বকুল সংক্ষেপে জবাব দিল।

পরেশের মনে হয় বকুল তাকেও ভুল বুঝেছে। সেটা পরেশের কাছেও বেদনার, কিন্তু বকুল দুঃখ পাবে সব কথা শুনলে। আর প্রমথের মত মানুষকে নিয়েই তাকে ও ঘর করতে হবে। তাই চুপ করে রইল পরেশ।

বকুল বলে—আপনার ব্যাপারটা রহস্যময়ই রয়ে গেল আমার কাছে।

পরেশ জানায়—ওটা রহস্যই থাক। তবে জেনে রেখো বকুল, আমিও মানুষ। আর, আমার স্বভাবটাও বুনো হয়তো আদিমই। আর সেইজন্য আদিম সত্বা যেটাকে আমি তোমার সংস্পর্শে এসে ভুলেছিলাম, ভুলে মানুষের মত বাঁচার স্বপ্ন দেখেছিলাম ওই কাল রাতে প্রমথ নিজের স্বার্থে আমার সেই আদিম বন্য স্বভাবটাকেই আবার জাগিয়ে তুলতে চেয়েছিল।

বকুল অবাক হয়ে শুনছে পরেশের কথাগুলো। তার কাছে এটা বিচিত্র বোধ হয়। পরেশ বলে,

—তারই প্রতিবাদ করেছিলাম মাত্র। আজ মনে হয় বকুল এখানে তোমাকে এনে ভুল করেছিলাম আমি। তোমাকেও নিদারুণ অস্বস্তির মধ্যে ফেলেছি। তুমি আমায় ক্ষমা করো।

পরেশ কথাগুলো শেষ করে বারান্দা থেকে নেমে চলে গেল। বকুল তখনও দাঁড়িয়ে আছে।

প্রমথের ডাকে চমক ভাঙ্গে বকুলের। প্রমথ হাঁক পাড়ে,

—কোথায় গেলে তুমি? তৈরী হয়ে নাও। রেরুতে হবে।

প্রমথের ডাকে বকুলের মনে হয় এই সবুজ ছায়া-আলো ভরা

বনরাজ্য থেকে তাকে চলে যেতে হবে। ফিরে যেতে হবে সেই বন্দীশালায়।

বের হবার আগে বকুল খুঁজছে পরেশকে। সকালের আলোয় ভরে উঠেছে বনপাহাড়। পাহাড়ের মাথায় সেই মন্দিরটা স্পষ্টতর হয়ে ওঠে। বকুল একটা আমলকী গাছেব নীচে পরেশকে দেখে এগিয়ে আসে।

বকুল বলে—কখন থেকে খুঁজছি তোমায়।

পরেশ ওর কালো চোখের দিকে চাইল। সকাল থেকেই পরেশ খুঁজে পাচ্ছে না হরিণটাকে। বর্ষার সজল মেঘ-এর ডাকে—কচি পাতাব রাজ্যে কি ডাক শুনে বনহরিণী উধাও হয়েছে কার সন্ধানে।

বলে ওঠে পরেশ—সকাল থেকেই পোষা হরিণটা আর পাচ্ছি না। এতদিন ছিল এখানে, আজ হারিয়ে গেল।

—তাই নাকি, চলে গেল?

বকুলের মনে পড়ে তার সুন্দর মায়া-ভরা চা'হনি। পরেশ আকাশ বনানীর দিকে চেয়ে বলে,

—ওরা থাকে না, ওই সবুজ বন, কচি পাতার হাতছানি আর কিসের ডাকে ঘর ছেড়ে ওরা হারিয়ে যায়। আর ফেরে না।

বকুল দেখছে কঠিন ওই মানুষটির চোখে হারিয়ে-যাওয়া সেই পলাতকার জন্য কি গভীর বেদনার ছায়া।

বকুল বলে—আমি চলে যাচ্ছি।

পরেশ ওর দিকে চমকে উঠে চাইল, ওর যাবার কথাটা যেন মনে ছিল না তার। পরেশ জবাব দিল না, ওর দিকে চাইল মাত্র। পরেশের চোখে ক্ষণিকের জন্য কি বেদনা টলটল করে ওঠে। জানে পরেশ ওরাও বন হরিণের মতই, দূর সবুজ স্নিগ্ধতার স্বপ্ন ওদের চোখে। শুধু ডাক দেয় আর হারিয়ে যায় জীবন দিগন্তের সীমা পারে। ওকে ধরতে চায় নি সে। বকুল দেখছে ওকে।

পাতার মর্মর ভেসে ওঠে বাতাসে বনভূমির দীর্ঘশ্বাসের মতই। বকুল চলে যাচ্ছে।

ওকে বাধা দেবার কোন দাবীই পরেশের নেই। এই কথাটাই মনে হয়। পরেশ বলে ওঠে—শুধু শুধু কষ্ট দিলাম তোমাকে।

বকুল দেখছে বিচিত্র মানুষটাকে। পায়ে পায়ে ওরা গাড়ির দিকে এগিয়ে আসে।

প্রমথ ইতিমধ্যে গাড়িতে উঠে বসে আছে। বকুলকে ফিরতে দেখে তাড়া দেয় প্রমথ।

—ওঠো। দেরী হয়ে গেছে, এতটা পথ যেতে হবে।

বকুল চুপ করে গাড়িতে উঠলো। প্রমথ যেন এখান থেকে চলে যেতে পারলে প্রাণে বাঁচে। যাবার মুখে তবু পরেশকে আমন্ত্রণ জানায়।

—আসছিস তো শহরে যাবার পথে?

পরেশ স্থির কণ্ঠে জানায়—শহরে যাওয়া আমার হবে না, এইখানেই রইলাম। মানুষের সমাজ ছেড়ে একবার বাইরে এলে তার আর ফেরা যায় না। সেখানের জ্বালাটাকে এড়াতে চাই। তাই এ বনবাসকেই মেনে নিইছি প্রমথ।

পরেশের চোখে সকালের আলোর আভা। বকুল চেয়ে থাকে ওর দিকে, দূরে আকাশের দিকে। পাহাড়ের বিস্তারে সেই মন্দির থেকে যেন দূরাগত ঘণ্টার শব্দ ভেসে আসে, পাকদণ্ডীর ছায়াঘন পথে কোনদিন আর দুর নীলিমায় হারিয়ে যেতে পারবে না বকুল।

ওর পালিয়ে যাওয়া হরিণটা কোন বনের গভীরে হয়তো উৎকর্ণ হয়ে ওই ডাক শুনেছে।

বকুল ফিরে চলেছে ওই বনপাহাড়ের জগৎ থেকে পলাশপুরের সেই জগতের দিকে। মুক্তির স্বপ্ন তার ব্যর্থ হয়ে গেছে। প্রমথর কথায় চাইল। প্রমথ বলে,

—বনে থেকে থেকে পরেশটা একটা জানোয়ার হয়ে গেছে। মদ গিলে কাল রাতে কি কাণ্ডটাই না বাধাতো আর একটু হলে। চলে এসে ভালোই করেছি, কি বলো?

বকুল জবাব দিল না।

বকুল চুপ করে বসে আছে। ওই পাহাড় বনভূমি ক্রমশঃ দূরে সরে যাচ্ছে। একটি স্বপ্নময় জগৎ বকুলের চোখের সামনে থেকে অন্তর্হিত হয়ে গেল, মুছে গেল।

তরঙ্গও বিপদে পড়েছে।

বাবার শরীরটা ভালো নেই। কিশোরী মদনও দেখে না এসব। ঘর খর্চাও দেয় না। ক'দিনেই তরঙ্গ বুঝছে তাদের সংসারের হাল বদলে গেছে। ভাইরা এবার সহরের স্বপ্ন দেখে, তাই চায় বুড়ো বাবাও এবার চোখ বুজুক।

তরঙ্গই বলে—বাবার অবস্থা ভালো বুঝছি না। টাকাকড়িও হাতে নাই, তোমরা টাকা কিছু দাও।

কিশোরী অবাক হয়—টাকা! ওসব তো বাবার হাতেই।

তরঙ্গ জানায়—কিছুই পাইনি। শহর থেকে বড় ডাক্তার আনাতে হবে। দেখছো না লোকটা বেহুঁসের মত পড়ে আছে।

কিশোরী কিছু বলার আগেই ওর বৌ শোনায়,

—তা আর কি করবো ঠাকুরঝি? যা হবার হবে। বয়স তো হয়েছে।

আর্তনাদ করে ওঠে তরঙ্গ—এ হতে পাবে না। তোমরা কিছু না করো আমিই করবো।

—ছ্যাখ। কিশোরী জবাব দেয়।

কিন্তু তরঙ্গের কিছু করার সাধ্য নেই। ইষ্টিশানের বৌদিও নেই, বাইরে গেছে। সেখানে তবু কথাটা আলোচনা করে পরামর্শ চাইতো। ওদিকে বাবার অবস্থাও খারাপ। আজই সহর থেকে ডাক্তার আনা দরকার।

তরঙ্গ কোন পথ না পেয়ে আজ ভজনের কাছেই এসেছে। জানে তরঙ্গ ভজন তাকে ফেরাতে পারবে না।

ভজন কয়েকদিন থেকে ওদিকের খবর রাখে না। এখন নিজের কাজ নিয়ে পড়েছে। নদীর ধারে একলপ্তে বেশ কিছুটা জমি আছে সেখানে চাষ সুরু হয়েছে। বীজ ধান বুনবে। সকালের ট্রেনে মালপত্র সহরে পাঠিয়ে মাঠে এসে নেমেছে সে। আলপথ ধরে ওইদিকে চলেছে ভজন।

মাঝে মাঝে পলাশের বন। তখনও গাঢ় লাল ফুলগুলো কোথাও পুঞ্জ পুঞ্জ রক্তের আভাষ আনে। হঠাৎ তরঙ্গকে দেখে থমকে দাঁড়ালো ভজন।

—তুমি!

তরঙ্গের মুখচোখ থমথমে। ওর মনে গভীর বেদনার আভাষ, দু'চোখ জলে ভরা। তরঙ্গ যেন নিজেকে ঠিক রাখতে পারে না। ভাই বৌদিদের অবহেলা ওকে আজ নিঃস্ব করে তুলেছে কি আঘাতে।

তরঙ্গ বলে—তোমার কাছেই যাচ্ছিলাম।

ভজন অবাক হয় ওর কথায়। তরঙ্গ বলে ওঠে,

—বাবার খুব অসুখ। বড় ডাক্তার আনতে হবে শহর থেকে। দাদা মদন ওরা কেউ টাকাও দেয় নি। বাবা বিনা চিকিৎসায় ওমনিভাবে শেষ হয়ে যাবে?

—তাই নাকি! ভজন চমকে ওঠে।

তরঙ্গ বলে—তোমার কাছেই এসেছি ভজন। আজ আর আমার যাবার কোন ঠাঁই নেই।

কি অসহায় কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে তরঙ্গ।

হঠাৎ কাদের পায়ের শব্দে চাইল ভজন। তরঙ্গও চমকে ওঠে।

কিশোরী আর মদনও এসে পড়েছে। ওরা যেন আজ তরঙ্গের পিছু পিছুই এসেছে সব ব্যাপারটা দেখতে। আর সেই চরম সুযোগ পেয়ে গেছে আজ তারা।

কিশোরী বলে—এই জন্য তোর পাপেই বাবা মারা গেল তরঙ্গ!

তরঙ্গ চমকে ওঠে—বাবা নেই?

মদনের চাপা রাগটা আজ প্রকাশ পায়—তুই-ই মেরেছিস বাবাকে। তোর এই নষ্টামিপনার জন্যে বাবা বিছানা নিল সেদিন থেকে, তবু থামিস নি তুই। আজ সব শেষ করেও খুশী হস্ নি তুই। এত পাপ তোর মনে ?

—বাবা নেই। তরঙ্গের সব চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গেল। কি অসহায় কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে সে। কিশোরী গর্জে ওঠে,

—আবার কান্না! ঢং।

মদন বলে—চুলের মুঠি ধরে মুখটা পাথরে ঠুকে দোব তোর। খবরদার ও বাড়ি মুখো হবি! কস্‌বি—বেশ্যা কোথাকার।

মদন বোনকে ওই অবস্থাতেই একটা চড় মারতে যায়, হঠাৎ কঠিন হাতের একটা ধাক্কাতে ছিটকে পড়েছে মদন। ভজন গর্জে ওঠে।

—যা তা বলবা নাই ছোট বাবু, আর বোনের গায়ে হাত তুললে ওই হাতটা আমি মুচড়ে ভেঙ্গে দোব।

মদন ততক্ষণে সামলে নিয়ে শোনায়,

—এতবড় মরদ তুই!

ভজন আজ শোনায়—তরঙ্গ তোমাদের ঘরে যাবে না। চল তরঙ্গ। ওই পাপের বাসা ছেড়ে তবু নোতুন করে বাঁচবি আজ থেকে।

তরঙ্গের সারা মনে আজ ঝড় ওঠে। এতবড় পৃথিবীতে সে একা। সামনে ওই নিষ্ঠুর দৈত্যের দল তার সব কেড়ে নিয়েছে, নিজেকে আজ যেন বেসাতিতে পরিণত করেছে সে শুধুমাত্র বাঁচার সমস্যা সমাধান করতে।

হঠাৎ সবকিছুই একটা নিষ্ঠুর ব্যঙ্গের মত মনে হয়। তরঙ্গ যেন বুঝেছে এইভাবে বেঁচে থাকার কোন সার্থকতা নেই তার কাছে।

কিন্তু!···

হঠাৎ খেয়াল হয়। ট্রেনটা আসছে কদমদহ ব্রীজের উপর চাকার গুম গুম শব্দ তুলে।

ওই ভারি ছন্দময় শব্দটা তাকে কি যেন হাতছানি দিয়ে ডাকছে।

কত পাখীডাকা সকাল, আলোভরা দিনের স্মৃতি মিশে আছে ওই শব্দে। ওটা আজ মুক্তির সুর আনে, আশ্বাস আনে।

তরঙ্গ ওই দিকে ছুটে চলেছে। পিছনে দেখা যায় যুধ্যমান কয়েকটা মানুষকে। লোভ লালসা আর মোহ নিয়ে ওরা যেন লড়াই করছে, আর তরঙ্গ সব কিছু থেকে মুক্ত হয়ে গেছে আজ।

হঠাৎ খেয়াল হয় ভজনের। সেও ছুটতে থাকে তরঙ্গের পিছনে।

মদন, কিশোরীও অবাক হয়েছে। ভজনের ডাকটা কানে আসে তরঙ্গের।

—তরঙ্গ, তরঙ্গ!

তরঙ্গ আজ ওদের ডাক—ওই বাঁধন থেকে মুক্ত হয়ে অনেক দূরে চলে এসেছে। লাইনে শব্দ ওঠে, সেই চাকার ছন্দটা তার রক্তে মাতন এনেছে। কি যেন বৈচিত্র জাগে একটা বেদনাহীন অনুভূতির গভীরে। তরঙ্গ কোথায় হারিয়ে গেছে অতল অন্ধকারে। কদম'দ, ওই পলাশতলির ফুলফোটা বন, সবুজ ক্ষেত সব কিছু অন্ধকারে হারিয়ে গেল।

কলরব ওঠে। ট্রেনটাও ব্রেক করেছে।

তার আগেই চাকার কঠিন চাপে তরঙ্গের সুন্দর দেহটা দলে পিষে থেঁতলে গেছে। পলাশতলির পলাশ ফুলগুলো কে যেন পুঞ্জ পুঞ্জ করে ওখানে ছিটিয়ে দিয়েছে। আর্তনাদ করে ওঠে ভজন!

কিশোরী-মদনের চক্রান্তের সব জ্বালা চুকিয়ে তরঙ্গ কোন দূর অজানা জগতে হারিয়ে গেছে।

.

বকুল প্রমথ পলাশপুরে ফিরেই খবরটা পেয়েছে। ছোটবাবুই জানায়—সুইসাইড কেস স্যার। মেয়েটাই ট্রেনে গলা দিয়েছিল।

বকুল অস্ফুট আর্তনাদ করে ওঠে—তরঙ্গ মরে গেল এমনি করে?

ছোটবাবু তার কথাটা জানায়—তবু ষ্টেশনের বাইরেই ঘটেছে, হয়রানী থেকে আমরা বেঁচে গেছি স্যার।

প্রমথ ওর কথাগুলো শুনছে। বকুলের দু'চোখ জলে ভরে আসে কি বেদনায়। ও দাঁড়ালো না। বাসার দিকে চলে গেল।

তরঙ্গের মৃত্যুটা এখানের আকাশ বাতাসে কি নিবিড় বেদনার সুর এনেছে।

প্রমথ বন পর্বত থেকে কি একটা নোতুন অনুভূতি নিয়ে ফিরছে। অনেক লোভই করেছিল সে, আর সেই পাবার জন্য সে বকুলকেও বাজী রাখতে চেয়েছিল। কিন্তু পরেশের মত অমানুষও তাকে যেন বুঝিয়ে দিয়েছে ওই সবের মূল্য বকুলের তুলনায় অনেক কম। জীবনে সামান্য পেয়েই আজ প্রমথ তৃপ্ত থাকতে চায় এই পলাশতলির শান্ত জগতে। লোভ-এর কোন দাম নেই। তাতে হারাতে হয় অনেক বেশী। আর সেই কঠিন সত্যটাকে আজ নোতুন করে অনুভব করেছে প্রমথ পলাশপুরে ফিরে।

বৈকালের দিকে শান্ত হলুদ রোদ ভরা নির্জন ষ্টেশনের বাইরে এসে দাঁড়িয়েছে প্রমথ। শূন্য চারিদিক। হঠাৎ ওপাশের ঝাঁকড়া বকুল গাছের ছায়ায় কাকে বসে থাকতে দেখে এগিয়ে আসে।

ভজন!···ওকে দেখে চেনা যায় না। চোখমুখে থমথমে বিষণ্ণতা। মুখে ক'দিনের দাড়িও রয়েছে। প্রমথ দেখছে ভজনকে।

—তুমি।

তরঙ্গের ওই মৃত্যুটা যেন ভজনকে বদলে দিয়েছে।

গজানন বৈকালে চা দিতে আসছিল ষ্টেশনে। ওকে দেখে বলে গজানন।

—ছেলেটা ক'দিনেই বদলে গেছে বড়বাবু।

গজানন ভজনকে বলে—তোর দোষ কি ভজন? যে যাবার সে তো গেছে। নিজের কথা ভাব এবার।

প্রমথ দেখছে নিঃশেষ ভালোবাসার করুণতম বিষণ্ণতায় আজ ভজন অন্য রূপে পরিবর্তিত হয়েছে।

ভজন বলে—সবই আমার দোষ বড়বাবু। আমার পাপেই তরঙ্গ চলে গেল এভাবে। আমার লোভ, আমার স্বার্থের জন্যে তার মরা ছাড়া বোধহয় আর পথ ছিল না।

চমকে ওঠে প্রমথ।

তার লোভ, তার স্বার্থও কম ছিল না। তার জন্য বকুলকেও সে বিসর্জন দিতে চেয়েছিল চরম লাঞ্ছনা আর অপমানের অতলে।

আজ কথাটা শুনে চমকে ওঠে প্রমথ। নিজেরও সারামনে তীব্র কি অনুশোচনার গ্লানি। পায়ে পায়ে সরে গেল প্রমথ।

ছোটবাবু কর্তব্যনিষ্ঠ ব্যক্তি। বাকী কাজগুলো সারার জন্য তাকে ষ্টেশনে আসতে দেখে প্রমথ বলে,

—একটু থাকুন আপনি। আমি আসছি।

প্রমথ বাসার দিকে এগিয়ে যায়। ছোটবাবু হঠাৎ বলে,

—একটা খবর ছিল বড়বাবু।

প্রমথ অন্যদিন খবর শোনার জন্য কৌতূহল বোধ করে, আজ খবরের কথায় উদাস চাহনিতে চাইল ছোটবাবুর দিকে। মনে হয় তার দেরী হয়ে যাচ্ছে, এই সময়টুকুতে সে সারামন দিয়ে আজ বকুলের সান্নিধ্য কামনা করে।

তবু শুধোলো প্রমথ—কি আবার খবর এল?

ছোটবাবু জানায়—ডোমরী, ওই মেয়ে সুইপার, ওর বদলির হুকুম এসে গেছে কাল, মেয়েটাও আজ চলে যেতে চায় সুদামডিতে।

প্রমথই ওটার জন্য লিখেছিল, কিন্তু এত তাড়াতাড়ি সেটা হয়ে যাবে ভাবেনি, ছোটবাবুর কথায় প্রমথ বলে,

—ছেড়ে দিতে অমত নেই, কিন্তু বদলি না পেলে কাজ চলবে কি ভাবে?

নন্দুও ঘুরঘুর করছিল। সেও শুনেছে ডোমরীর বদলির খবর। ওই কাজের কথা শুনে নন্দুই বলে ওঠে,

—সে কদিন স্যার আমাদের বৌটাকেই বলবো একটু দেখে শুনে করে দেবে, আর আমিও তো রইলাম।

নন্দুও চায় ডোমরী চলে যাক এখান থেকে।

বড়বাবু বলে—দেখুন তাহলে ছোটবাবু। কাজ চালাতে পারেন ছেড়ে দিন ওকে।

প্রমথ বের হয়ে বাসার দিকে এগোলো।

রূপসীও শুনেছে তার চাকরীর খবরটা। একটা মহাপাপকে বিদেয় করেছে ওই বড়বাবু। রূপসী মনে মনে খুশি হয়ে কাজ করছিল বকুলের বাসায়, বড়বাবুকে আসতে দেখে বলে,

—বৌদি তো নাই। ওই কদমদ'র দিকে গেছে। কতো করে না করলাম, সবে চেনাজানা মেয়েটা আত্মঘাতী হয়েছে, ওখানে যেও না। তা শুনলে আমার কথা?

প্রমথ জানে বকুল তরঙ্গকে সত্যিই ভালোবাসতো। মেয়েটার ওই দুর্ঘটনায় বকুল মনে মনে আঘাত পেয়েছে, হয়তো ওখানেই গেছে।

প্রমথ পায়ে পায়ে লাইন ধরে কদমদ'র পলাশবনের দিকে এগোলো।

বৈকালের পড়ন্ত সোনাগলা রোদে কদমদ'র পলাশ বন ভরে গেছে। নদীর বুকে ওঠে জলস্রোতের শব্দ। বকুল এখানে কি এক দুর্বার টানে এসে পড়েছে। তরঙ্গের কথা মনে পড়ে।

তরঙ্গও স্বপ্ন দেখেছিল ভজন বড় কারবারী হবে। তরঙ্গ আর ভজন দু'জনে ঘর বাঁধবে। সুখী হবে। বকুলের চোখের সামনে তরঙ্গের খুশি উছল চোখ, সেই সুন্দর মুখখানা ভেসে ওঠে।

কিন্তু সব হারিয়ে গেছে। মেয়েটাকে ওরা চরম অপমান করেছিল। মিথ্যা অপবাদের কালিতে ওর মুখ ভরে দিয়েছিল, সেই অপমানের প্রতিবাদে তরঙ্গ নিজেকেই শেষ করে দিয়েছে।

সবুজ বনের আলো-ছায়ার ঈশারায় কোন পাখীর সুরের

মায়ায় ওই বেদনারক্তিম জগৎ থেকে সে পালিয়ে গেছে মুক্তির সন্ধানে হারানো বনহরিণীর মতই।

কি দুঃখ আর বেদনায় বকুলের শূন্যমন ভরে ওঠে। তরঙ্গের দুঃখের সঙ্গে তার জীবনের শূন্যতারও কোথায় নিবিড় সাযুয্য রয়ে গেছে। হঠাৎ কার পায়ের শব্দে চাইল বকুল।

অবাক হয় প্রমথকে দেখে। বকুল চেয়ে থাকে প্রমথের দিকে।

প্রমথ বলে,—এখানে রয়েছো?

বকুল দেখছে প্রমথের কণ্ঠে কি একটা ব্যাকুলতার স্বর ফুটে ওঠে।

সন্ধ্যা নামছে বনে বনে, বাসায় ফেরা পাখীদের কলরব ওঠে।

প্রমথ বলে,—মেয়েটাকে খুবই ভালবাসতে তুমি, না?

বকুল মাথা নাড়ে। প্রমথ জানায়—তাই দুঃখও পেয়েছো। ভজন-কেও দেখলাম। ছেলেটা একেবারে ভেঙ্গে পড়েছে। বলে কি জানো?

বকুল প্রমথের দিকে চেয়ে থাকে। প্রমথ বলে,

—ওর দুঃখ, ওর লোভের জন্যই মেয়েটা বাঁচার পথ না পেয়ে এই ভাবে নিজেকে শেষ করে দিয়ে গেল।

বকুল বলে—কে জানে!

প্রমথ আজ নিজের জীবনেও অনুভব করে এতদিনের ভুলটা। ওই বনে গিয়ে সেটা আরও বড় করে দেখেছে, বুঝতে পেরেছে।

প্রমথ বলে—হয়তো ওটাও একটা কারণ বকুল। পুরুষের বুকজোড়া লোভ, লালসা, হীন স্বার্থের আগুনে অনেক মেয়েরই এমনি চরম সর্বনাশ ঘটে। আজ এটাও বুঝেছি এদের জীবন থেকে এ শিক্ষার দরকার ছিল আমার।

বকুল প্রমথকে দেখছে। আজ যেন ও একটা অন্য মানুষ।

দিনশেষের আরক্তিম আলোর আভা এই নিভৃত প্রান্তর নদীর ধারাকে বেদনাতুর করে দিয়েছে।

প্রমথ বলে,—চলো ফেরা যাক।

বকুল আর প্রমথ কোন বেদনার রাজ্য থেকে ভারি মন নিয়ে

ফিরছে। বকুলের মনে একটা নোতুন তৃপ্তির স্বপ্ন জাগে। এই রূপরাজ্য শান্ত বনভূমি তার মনের সব শূন্যতাকে কি এক পাওয়ার স্বপ্নের বর্ণালীতে ভরিয়ে দিয়েছে।

ষ্টেশনের প্লাটফর্মে কয়েকটা বাতি জ্বলছে। শেষ গাড়ির সময় হয়ে গেছে। প্লাটফর্মে দু'চার জন যাত্রী ছড়িয়ে রয়েছে।

বকুল আর প্রমথ এদিকে এগিয়ে চলে। হঠাৎ বকুল সামনে ডোমরীকে দেখে দাঁড়ালো। ওর পরনে নোতুন শাড়ি, একরাশ চুলে নেবু তেল মেখেছে, কপালে পরেছে সিন্দুরের টিপ, পিছনে একটা লোক জড় সড় হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, তার হাতে ডোমরীর রংচটা সুটকেশটা।

বকুল আর প্রমথকে দেখে ডোমরী বগলের পুটুলিটা নামিয়ে প্রণাম করতে বকুল অবাক হয়।

—কি রে! এতো পেন্নামের কি হল হঠাৎ?

স্বৈরিণী মেয়েটাকে আজ চেনা যায় না। একেবারে ঘরের বৌ সেজে গেছে। ডোমরীর গলার স্বরে এসেছে নম্রতা। মেয়েটা বলে,

—ইখান থেকে চলে যাচ্ছি বৌদিমণি। যাবার আগে পেন্নাম করবো নাই গ!

বকুল অবাক হয়—চলে যাচ্ছিস এখান থেকে?

ডোমরী সলজ্জ ভাবে জানায়—বড়বাবুই লিখাপড়া করে সুদামডি বদলি করে দিলেক। ঘরের লুকটা উখানেই থাকে কিনা। দু'জনে উখানেই থাকবো, কাজ কাম করবো।

বকুল খবরটা শুনে খুশি হয়ে বলে—তাই যা। মন দিয়ে ঘর সংসার করিস।

ডোমরী সলজ্জ ভাবে পিছনের লোকটাকে দেখিয়ে বলে—উভি এসে গেল লিয়ে যেতে। কইরে আয় ইদিকে। বৌদিদিমণিকে পেন্নাম কর। এত ভয় কিস্‌কে হে?

লোকটা ভয়ে ভয়ে এগিয়ে এসে নমস্কার করে। বকুল দেখছে ওদের, আজ মনে হয় ওরা সুখী হোক।

ট্রেনটা ষ্টেশনে ঢুকছে। ডোমরীও ওই ট্রেনে চলে গেল নিজের ঘরে।

ওর জীবনের সেই হাহাকারটাকেও দেখেছিল বকুল। ডোমরী আজ শান্তির আশ্বাস পেয়েছে।

রাত নামে নির্জন প্রান্তরে।

গজাননের দোকানে মিটমিট বাতিটা জ্বলছে। ওর রামায়ণ পড়ার শব্দ ওঠে শান্ত ছায়া-আঁধার ঘেরা ওই পরিবেশে। বকুল আর প্রমথ চলেছে বাসার দিকে। অন্ধকার বাগানে দুটো মূর্তিকে দেখে চাইল বকুল। নসু আর রূপসী দুটোতেই মদ গিলেছে এন্তার, আর গান গাইতে গাইতে ফিরছে কোয়ার্টারের দিকে। ডোমরী বিদেয় হয়েছে, আর তার অস্থায়ী চাকরীটা পেয়েছে রূপসী। তাই খুশির চোটে আজ ওরাও হারিয়ে গেছে তাদের নিভৃত জগতে।

বকুল দেখছে প্রমথকে। তারা-জ্বলা অন্ধকারে একফালি চাঁদের আলো এসে পড়েছে ঘন গাছ-গাছালির ফাঁক দিয়ে। বকুল দেখছে প্রমথর মুখে সেই নরম মৃদু আলোর স্বপ্নাভাষ।

বকুল নোতুন মানুষটার দিকে চেয়ে থাকে। প্রমথ বলে,

—তোমার যোগ্য আমি নই বকুল, অনেক অবিচার করেছি তোমার উপর শুধুমাত্র অধিকারের দাবীতে।

প্রমথর কণ্ঠে কি বেদনার সুর জাগে। বকুল ওর দিকে চাইল বিস্মিত নির্বাক চাহনি মেলে। একটা কোকিল ডেকে ডেকে থেমে গেল, ভিজে বাতাসে মল্লিকার উদগ্র সুবাস জাগে। শান্ত সুন্দর একটি রূপজগৎ, পলাশপুরের নির্জনতার মাঝে বকুল নিজেকে আবিষ্কার করে আজ নোতুন করে।

অনেক কিছুই চেয়েছিল সে, তার নিজের স্বার্থ—অন্ধ ব্যক্তিত্ব আর প্রমথের ওই হৃদয়হীন স্বামীত্বের দাবীই তাদের জীবনে এনেছিল জটিলতা, সংঘাত। ভালবাসার সমতলে ওরা কেউ নেমে আসতে

পারে নি, ওদের নিজ নিজ মন ছড়িয়ে ছিল নিজেদের সুউচ্চ কামনার শিখরে। তাই ওরা ছিল পরস্পরের থেকে অনেক দূরে। নিজেদের মধ্যে গড়ে উঠেছিল দুস্তর বেদনাময় ব্যবধান।

সেই ভুলটাকে আজ ওরা বুঝেছে অনেক মৃত্যু, অনেক দীর্ঘশ্বাস—ডোমরীর আনন্দ আর পরেশের কাঠিন্যের মাঝে। সবকিছুর সঞ্চয় তাদের মনকে তাই বদলে দিয়েছে। পিছনের সব পরিচয়কে হাবিয়ে ওরা দু'জনে আজ নোতুন করে দু'জনকে খুঁজে পায়।

—বকুল! প্রমথ আজ ওকে ডাকছে।

বকুল আজ প্রমথের বুকে স্বেচ্ছায় ধরা দিয়েছে ওই ছায়ান্ধকার জোনাকী-জ্বালা রাত নির্জনে। এ এক নোতুন মিলন রাত্রির শুভলগ্ন।

সকালের আলোভরা জগৎ। রূপসী চা এনেছে, মনে পড়ে বকুলের আর একজনকে। এই সময় মাথাব ঝকঝকে দুধের কেঁড়ে নামিয়ে মুখে হাসির বান ডেকে তরঙ্গ ঢুকতো। আজ সে আর আসবে না, কোনদিনই আসবে না। তরঙ্গের হারানো ব্যাকুলতা জেগেছে বকুলের মনে—এসেছে জীবনকে ভালোলাগার স্বপ্ন।

প্রমথ চা খেয়ে স্টেশনে চলে গেল, দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে বকুল। হঠাৎ চোখে পড়ে সকালের আলোভরা দূরের সেই পাহাড় বন সীমাকে, সকালের আলোয় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে পর্বত শীর্ষের সেই সাদা বিন্দুটা। বাতাসে কিসের শব্দ ভেসে ওঠে—দূরাগত ঘণ্টার শব্দ, পাখীর ডাক। ওখানে হয়তো কোনদিনই পৌছতে পারবে না বকুল। ওই আলোক শীর্ষের স্বপ্ন নিয়েই থাকবে সে চিরকাল। বনহরিণীটা হয়তো পাহাড়ের ওই চূড়ার দিকে চলেছে—তার কাজলকালো চোখে হারিয়ে যাওয়ার তৃপ্তি। তরঙ্গ ওই আলোর জগতে কোথায় হারিয়ে গেছে।

বকুল ঘরের কাজে মন দেয়, ওই দরজাটা বন্ধ করে দিয়েছে সে। ওই পাহাড় বন—ওই আলোকবিন্দুকে দেখতে চায় না বকুল। ও দূরের স্বপ্ন হয়েই থাকুক